বামাবোধিনী পত্রিকা।

No. 527. July, 19

BAMABODHINI PATRICA.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ"

৪৫ বর্ষ। ৫২৭ সংখ্যা। { আষাঢ়, ১৩১৪। জুলাই, ১৯০৭। } ৮ম কল্প। ৪র্থ ভাগ।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

রাজভ্রমণ—সাম্রাজ্ঞী আলেকজাণ্ড্রা ভূমধ্যস্থসাগর ভ্রমণ করিয়া নির্ব্বিঘ্নে লণ্ডনে ফিরিয়াছেন।

বুদ্ধোৎসব—গত (১২ই জ্যৈষ্ঠ) বৈশাখী পূর্ণিমায় বুদ্ধদেবের জন্ম, সিদ্ধিলাভ ও পরিনির্ব্বাণ উৎসব উপলক্ষে কলিকাতায় বৌদ্ধদিগের এক মহাসভা হইয়াছে। বাবু নরেন্দ্রনাথ সেন সভাপতি ছিলেন এবং ধর্ম্মপাল মহোদয় বক্তৃতা করেন।

আর্য্য সমাজের রাজভক্তি—সার ডেনজিল ইবেটসনের বিলাতযাত্রাকালে আর্য্যসমাজের লালা হংসরাজ ও রায় বাহাদুর মোহনলাল প্রভৃতি কয়েকজন আর্য্য সমাজের প্রধান সভ্য তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া কয়েকখানি ধর্ম্ম পুস্তক উপহার দিয়াছেন। পঞ্জাবী ছোট লাট একটু অনুযোগ করিয়া পরে ইঁহাদের রাজভক্তির জন্য সন্তোষ প্রকাশ করিয়াছেন।

ছোট লাটের আরোগ্য—সার আণ্ড্রু ফ্রেজার দার্জিলিঙে পীড়িত ছিলেন, আরোগ্যলাভ করিয়াছেন শুনিয়া সুখী হইলাম।

রাজ-সম্মাননা—ইংলণ্ডেশ্বর সিপাহী বিদ্রোহকালীন দিল্লী ও লক্ষ্ণৌ-আক্রমণকারী সেনাপতিদিগের ১১৪ জনকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। গত ৩রা জুনের বিশেষ রাজদরবারে উঁহাদিগের বিশেষ সম্মাননা করা হইয়াছে।

আমীরের বিলাত ভ্রমণ—আগামী ১৯০৮ সালে কাবুলের আমীর ইংলণ্ড ভ্রমণের মানস করিয়াছেন।

চিনে স্ত্রীজাতির উন্নতি—চিনের চ্যাঙ নামে রাজকর্ম্মচারীর স্ত্রী স্ত্রীজাতির উন্নতিকল্পে একখানি দৈনিক পত্র প্রচার করিতেছেন, ইহার নাম "Peking Woman's News" পিকিঙের স্ত্রী-সংবাদপত্র। ১৯০৪ সাল হইতে ইহা প্রকাশিত হইতেছে।

হাকিম সাহেবের দণ্ড—বরিশালের প্রসিদ্ধ জ্যাক সাহেবের নামে স্বদেশ-হিতৈষী বাবু অশ্বিনীকুমার দত্ত যে মান-হানির অভিযোগ করিয়াছিলেন, তাহাতে আদালতের বিচারে খরচাসহ ১০১ টাকা ডিক্রী পাইয়াছেন।

লর্ড মিণ্টোর সদ্বিবেচনা—যে (Colonization Bill) ঔপনিবেশিক আইন পঞ্জাববাসীদিগের অসন্তোষের কারণ হইয়াছিল, তাহা স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের অনুমোদিত হইলেও লর্ড মিণ্টো অগ্রাহ্য করিয়াছেন।

হিন্দু বিধবাশ্রম—পুনাতে স্বর্গগত রাণাডের গুণবতী পত্নী যে আশ্রমের নেত্রী, তাহার উন্নতির সংবাদ পাইয়া আমরা পরমাহ্লাদিত হইলাম। গত ১৯০৬ সালে ইহার অধিবাসিনীর সংখ্যা ৬০ হইতে ৭৫ হইয়াছে। বার্ষিক আয় ২২ হাজার টাকা, তন্মধ্যে ১২ হাজার টাকা ব্যয় হইয়াছে। আশ্রমস্থ একটী মহিলা প্রবেশিকায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

স্ত্রীস্বত্বাধিকার—সুসভ্য ইংরাজজাতি আজও স্ত্রীজাতির প্রকৃত স্বত্বাধিকার দানে কেবল কুণ্ঠিত নহেন, কিন্তু তাহার বিরোধী। রুসিয়ার ফিন্‌লণ্ডবাসিনীদের ন্যায় অষ্ট্রীয়ার মহিলারাও পার্লেমেণ্টে বসিবার ও ভোট দিবার অধিকার পাইয়াছেন।

ভাগবতোপাখ্যান।

পরাশর-নন্দন ব্যাসদেব বেদাদি গ্রন্থ সকল সঙ্কলন ও কল্পবৃক্ষসম বেদার্থ-প্রতিপাদক মহাভারত গ্রন্থ জাতি-নির্ব্বিশেষের হিতার্থে রচনা করিয়া এবং প্রাণায়ামাদি কঠোর তপস্যাপরায়ণ হইয়াও হৃদয়ে তৃপ্তিলাভ করিতে পারিলেন না। একদা অতিশয় অপ্রসন্নমনে সরস্বতী-নদীতীরে নির্জ্জনে অবস্থিতি করতঃ নিজের অপ্রসন্নতার হেতু বিতর্ক করিতেছেন, এমন সময়ে সেখানে দেবর্ষি নারদ আসিয়া উপস্থিত হইলেন। নারদকে দেখিয়া বেদব্যাস সসম্ভ্রমে গাত্রোত্থান করতঃ তাঁহার যোচিত অভ্যর্থনা করিলেন। নারদ ব্যাসদেবকে অন্য দিন অপেক্ষা কিছু বিষন্ন দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "আজ তোমাকে এরূপ দেখিতেছি কেন?" ব্যাস উত্তর করিলেন "দেখুন, আমি নিয়মিত ব্রতধারী হইয়া বেদমার্গ অবলম্বন করিয়াছি—অগ্নি গুরু ইত্যাদির যথা-বিহিত অর্চ্চনা ও হোম যাগ করিয়াছি এবং লোকহিতার্থ ধর্ম্মশাস্ত্র সকল রচনা করিয়াছি, তথাপি আমার চিত্ত প্রসন্ন হইতেছে না। আমি আত্মারাম ও আত্মতৃপ্ত হইতে পারিতেছি না। এত বেদাধ্যয়ন করিলাম, এত ব্রহ্মস্বরূপ বিচার করিলাম, এত তপস্যা করিলাম,

কিন্তু হৃদয়ের অভাব দূর হইল না, আমি এখন কি করিব?" নারদ বলিলেন "শাস্ত্রাধ্যায়ন ও ব্রহ্মস্বরূপ নিরূপণে, ব্রতাচরণ ও প্রাণায়ামাদিতে, কেবল বিধি ও নিষেধ মানিয়া চলিলে হৃদয়ে প্রেম-ভক্তি উৎপন্ন না। ভগবানে মতি ও রতি জন্মান চাই। তাঁহার অখিল লীলা-রসে মগ্ন না হইলে বাহিরের বৈরাগ্য বা যাগ, যজ্ঞ, তপস্যায় কি ফল? তাহাতে হৃদয়ের শুষ্কতা ঘুচিবে না; বরং দিনের পর দিন কঠোর হইতে কঠোরতর হইবে। স্বচ্ছবালুরাশিতে যেমন তৃষ্ণা নিবারণ হয় না, তেমনি শুষ্ক ব্রহ্মজ্ঞানেও হৃদয়ের পিপাসা যায় না। তুমি ব্রহ্মবিচার করিয়াছ, কিন্তু তাঁহার বিমল যশঃকীর্ত্তন কর নাই, তাঁহার নিত্য লীলা দর্শন কর নাই। ভগবানের লীলা-রসাস্বাদন করিতে না পারিলে কিছুতেই প্রাণ জুড়াইবে না, অতএব তুমি এখন হইতে ভগবানের যশঃকীর্ত্তনে ও তাঁহার মধুর লীলা বর্ণনে নিযুক্ত হও, দেখিবে অচিরে তোমার হৃদয় প্রসন্ন হইবে। তোমার বিষাদ-মেঘাচ্ছন্ন হৃদয় আকাশ নির্ম্মল হইয়া প্রেমচন্দ্রের জ্যোৎস্নায় উদ্ভাসিত হইতে থাকিবে। প্রেমভক্তি বিনা তপস্যার কি প্রয়োজন? আর প্রেমভক্তি হইলে তপস্যারই বা কি প্রয়োজন? ভক্তিহীন কর্ম্ম বন্ধনের হেতু, ভক্তিবিহীন জ্ঞান শূন্যবাদে পরিণত হয়। প্রবৃত্তি বা নিবৃত্তি ইহার কিছুই পরম ধর্ম্ম নহে। ভগবানের নিত্যলীলা দর্শন এবং সেই লীলা-রসাস্বাদনই একমাত্র পরম ধর্ম্ম। ইহাতেই জীবের বুভুৎসার পরিতৃপ্তি হয়।"

নারদের এই আশ্বাসবাক্যে উদ্দীপিত হইয়া ব্যাসদেব সেই সরস্বতী-জলে আচমনানন্তর অতীন্দ্রিয় ভগবানে চিত্ত-সমাধানপূর্ব্বক ভক্তিযোগে তাঁহার অরূপ-রূপ দর্শনে কৃতার্থ হইলেন এবং মায়াভিভূত অজ্ঞান লোকদিগের হিতার্থ লীলা-রসময় এই শ্রীমদ্‌ভাগবতরূপ ভক্তিরসাত্মক গ্রন্থ রচনা করিলেন। ইহার নিগূঢ় তাৎপর্য্য গ্রহণ করিতে গিয়া অনেকে অনেক প্রকার অর্থ করিয়াছেন, বিশেষতঃ অস্মদ্দেশীয় গোস্বামী সম্প্রদায় ইহাকে বিকৃত অবতার-বাদে পরিণত করিয়াছেন। তাঁহারা ভগবানে সচ্চিদানন্দ অরূপ রূপের সহিত জড়মূর্ত্তি ও জড় রূপের সংমিশ্রণ করিয়াছেন, বিশেষ মূর্ত্তিতে তাঁহার প্রকাশ ও লীলা দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। যাহা হউক, তাঁহারা প্রেম ও ভক্তির যে উচ্ছ্বাস দেখাইয়াছেন, সেজন্য শুষ্ক জ্ঞানী মানুষ তাঁহাদের চরণে লুণ্ঠিত হইয়া ভগবৎপ্রেম ও ভক্তি শিক্ষা করিবে। আমরা এই শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থ হইতে পাঠক পাঠিকাদের চিত্তভোষণার্থ মধ্যে মধ্যে কিছু কিছু সার সঙ্কলন করিয়া দিয়াছি। সম্প্রতি ব্যাসদেব কুন্তিদেবীর মুখ দিয়া শ্রীকৃষ্ণের যে স্তব করিয়াছেন, তাহার কিঞ্চিৎ উল্লেখ করি।

"হে ভগবন্, হে কৃষ্ণ! তোমাকে নমস্কার করি। তুমি অনাদি হইয়া সকলের আদি হইয়া আছ, তুমিই

প্রকৃতির নিয়ন্তা। তুমিই সকল প্রাণীর অন্তর ও বাহ্য পূর্ণ করিয়া রহিয়াছ অথচ তোমাকে কেহ জানিতে বা বুঝিতে পারে না। তোমাতে সকল বিরুদ্ধ গুণের সমাবেশ, আবার তুমি গুণাতীত। তুমি মায়ারূপ তিরস্করণী (পরদা) দ্বারা আপনাকে আচ্ছাদিত করিয়াছ। ইন্দ্রিয়-জনিত জ্ঞান দ্বারা তোমাকে কিরূপে জানা যাইবে? ইন্দ্রিয়গণ সেই মায়ার বিকার। তুমি অপরিচ্ছিন্ন, মূঢ়দৃষ্টি মানুষ যেমন নাট্যধর নটকে চিনিতে পারে না, সেইরূপ দেহাভিমানী নরনারী তোমাকে দেখিয়াও চিনিতে পারে না। হে বিশ্বাত্মন্, তুমি অজ হইয়া সর্ব্বজীবে বিদ্যমান আছ, কেবল ইহাই নহে; কিন্তু নিজ অদ্ভুত চরিত্র দ্বারা তাহাদের চরিত্র দিন দিন উন্নত ও বিশুদ্ধ করিতেছ। তোমার লীলা আমি অবলা কি বলিব? তোমার প্রকাশে জগৎ মোহিত হইয়াছে, কি আর বলিবে? তুমি স্থূল হইতে স্থূল এবং সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্ম হইয়া আছ, তাই অনেকে অনেক প্রকারে তাহা বর্ণনা করিয়া থাকেন। মলয় পর্ব্বতের কীর্ত্তি বিস্তারের জন্য যেমন তাহাতে চন্দনতরু জন্মিয়া থাকে, সেইরূপ হে ভগবন্! মানবের গৌরব বর্দ্ধনার্থ তুমি তাহার হৃদয়ে জন্ম-গ্রহণ কর। কেহ বলেন এই সংসার পরম আনন্দস্বরূপের আবরণরূপা অবিদ্যা এবং তদুৎপন্ন কাম্য কর্ম্মাদি দ্বারা জীব সকল ক্লিশ্যমান হইতেছে দেখিয়া তুমি স্বয়ং ধর্ম্মাচরণ দ্বারা তাহাদিগকে ধর্ম্মশিক্ষা দিবার জন্য জন্মগ্রহণ করিয়া থাক। কেহ বলেন তুমি দেবকী নন্দন, বসুদেবতনয়; যশোদার বাৎসল্যে, শ্রীদামাদি রাখালদিগের সখ্যে, রাধিকার প্রেমে তুমি আবদ্ধ, তুমি গোপীজনের প্রাণবল্লভ। প্রভু! এ সকলি তোমার মায়িক রূপ। তোমাকে যে যে ভাবে ভজিতে চাহিয়াছে, তুমি তাহাকে সেই সেই ভাবে ভজনা করিতে দিয়াছ, কিন্তু তোমার এই মায়িক ভজনের অবসানে তোমার স্বরূপ তুমি প্রকাশ করিয়াছ। হে বাঞ্ছাকল্পতরু! তুমি জীবের বাঞ্ছা অপূর্ণ রাখ না। তাহার বাঞ্ছিতরূপে তাহার কাছে প্রকাশিত হইয়া তাহার সকল বাসনা, সকল কামনা পূর্ণ করিয়া, তাহার ভবদুঃখ হরণ করিয়া যখন দেখা দাও, তখনি হে হরি, সে তোমার প্রকৃতরূপ দেখিতে পায়, এবং চিরজীবন তোমারি শরণাপন্ন হইয়া থাকে। হে ভক্তজনবল্লভ, তুমি ভক্তেরই প্রাণধন, ভক্তগণই তোমার সর্ব্বস্ব, তুমি তাহাদিগকে ছাড়িয়া থাকিতে পার না। ধর্ম্ম, অর্থ, কাম এ সকলে তোমার অভিলাষ নাই, তুমি আত্মারাম এবং শান্ত, আমি তোমাকে নমস্কার করি। হে ভগবন্! তোমার কেহ প্রিয় বা অপ্রিয় নাই, সকলের প্রতি তোমার সমান ভাব, কিন্তু তোমার ভক্ত ভিন্ন এ কথা অন্যে বুঝিতে পারে না। তুমি সকল জীবে সমভাবে বিদ্যমান আছ অথচ ধর্ম্মান্ধ লোকে তোমাকে নিমিত্ত করিয়া পরস্পর কলহ

করে, তোমাতে বৈষম্য দৃষ্টি করে। হে জগদ্‌গুরো, লোক সকলের সম্পদ ঐশ্বর্য্যই তাহাদের দুঃখের কারণ হয় —কেননা সদ্বংশে জন্ম, ঐশ্বর্য্য, বহু শাস্ত্রে জ্ঞান এবং ক্রিয়াকলাপে লোকের মদই বৃদ্ধি পায়, সুতরাং সে আপনাকে অকিঞ্চন ভাবিতে পারে না। তুমি অকিঞ্চন-ধন। অনন্যগতি ও অনন্য-মতি না হইলে তোমার দর্শন পাওয়া যায় না। হে কৃষ্ণ, তুমি আমাদিগকে নিরন্তর এই সংসারে বিপদের মধ্যেই রাখ, তাহা হইলেই তোমাকে নিকটে পাইব, তোমাকে ডাকিব, তোমার শরণাপন্ন হইব, আর তুমি আমাদিগকে বিপন্ন দেখিয়া কখনই ছাড়িতে পারিবে না। হে হৃষীকেশ, আমি নারী হইয়া আর তোমার কি স্তব স্তুতি করিব? তুমি অনাত্মাত্ম-বিবেকী পরমহংস, ও মননশীল রাগদ্বেষ-বিরহিত মুনিগণেরও জ্ঞানের অগোচর, আমি আর তোমাকে কি বলিব? তোমাকে মানবীয় ভাবে আমি যে আদর করিয়াছি, তুমি আমার সেই অপরাধ মার্জ্জনা কর—আর হে বিশ্বেশ্বর, হে বিশ্বাত্মন্, হে অখিলগুরো, হে ভগবন্, আমি অতি ব্যাকুল হইয়া তোমার নিকট এই প্রার্থনা করিতেছি, পাণ্ডব ও যাদব-গণের প্রতি আমার যে দৃঢ় মায়িক স্নেহ-বন্ধন আছে, তাহা তুমি ছেদন করিয়া দেও এবং এখন হইতে আমার মতি অনন্যবিষয়িণী হইয়া তোমাতে প্রীত হউক, তাহা হইলে গঙ্গা যেমন সাগরে মিলিত হইতে গিয়া প্লবকে বিঘ্ন বলিয়া মনে করে না, তদ্রূপ আমার মতি ও গতি তোমাতে মিলিতে গিয়া কোনও প্রতি-বন্ধক গণনা করিবে না।

শ্রীকেদারনাথ কুলভী।

রসায়ন।

সায়নোজেন বা নীলজন।

Cyanogen (CN or Cy)

NC=26

ইতিহাস—১৮১৪ অব্দে গে লুসাক্ (Gay-Lussac) সাহেব ইহা আবিষ্কার করেন। অঙ্গার যবক্ষার জলের সহিত সংযুক্ত হইয়া সায়েনোজেন নামক পদার্থ উৎপন্ন করে। ইহা হইতে অনেক নীল-বর্ণ পদার্থ উৎপন্ন হয় বলিয়া ইহাকে নীলজন কহে।

ধর্ম্ম—ইহা বর্ণহীন বায়বীয় পদার্থ। ইহার এক প্রকার বিশেষ গন্ধ আছে। জলে অধিক দ্রব হয়। ইহার গন্ধ পিচ-ফলের শাঁসের বা আঁটির গন্ধের অনুরূপ। ইহার দহনে C২০ বা শৈত্য সহযোগে ইহাকে তরল ও কঠিন করা যাইতে পারে। ইহা অত্যন্ত বিষাক্ত। সায়নো-

জেন যৌগিক পদার্থ হইলেও রূঢ় পদার্থের ন্যায় ইহার পরমাণু অপরাপর পদার্থের সহিত সংযুক্ত হইয়া নানাবিধ যৌগিক পদার্থ উৎপন্ন করে। এজন্য ইহাকে যোগরূঢ় (Compound Radical) পদার্থ কহে এবং এই নিমিত্তই ইহার অপর চিহ্ন Cy হইয়াছে।

প্রস্তুত-প্রণালী—মার্কিউরিক্ সায়নাইডকে (Mercuric Cyanide) উত্তপ্ত করিলে Cy বিমুক্ত হয়, পারদ থাকিয়া যায়; যথা—$Hg\ Cy_2 = Hg + Cy_2$ অঙ্গার ও যবক্ষারজন সাক্ষাৎ সম্বন্ধে সংযুক্ত হইয়া Cy উৎপন্ন করে না। কয়লা ও পটাসিয়ম্ কার্ব্বনেট উত্তপ্ত করিয়া তাহার উপর দিয়া N (যবক্ষারজন) বাষ্পের স্রোত চালাইলে পটাসিয়ম্ সায়েনাইড্ প্রস্তুত হয়। সচরাচর উক্ত প্রকারে পটাসিয়ম সায়েনাইড প্রস্তুত করে না। সিং, চামড়া প্রভৃতি জান্তব পদার্থে পটাসিয়ম কার্ব্বনেট ও লৌহচূর্ণ একত্র করিয়া অত্যন্ত উত্তপ্ত করিলে পটাসিয়ম্ ফেরো-সায়নাইড্ প্রস্তুত হয়; তাহা হইতেই পটাসিয়ম্ সায়নাইড প্রস্তুত হয়।

৬৫ ভাগ পটাসিয়ম সায়নাইড্ ও ১৭ ভাগ আর্জেন্টিক নাইট্রেড পৃথক্ পৃথক্ রূপে জলে গুলিয়া মিশাইয়া রাখিলে এক প্রকার শ্বেতবর্ণ পদার্থ জন্মে। ঐ পদার্থ শুষ্ক করিয়া পরীক্ষা-নলে উত্তপ্ত করিলে সায়নোজেন প্রাপ্ত হওয়া যায়। প্রবল বিষধর্ম্মী বলিয়া এই গ্যাস যখন তখন সংগ্রহ করা উচিত নহে।

হাইড্রসায়েনিক এসিড।

Hydrocyanic Acid.

$HCN = ২৭$।

ইহার অপর নাম প্রসিক এসিড (Prussic Acid)। এক ভাগ সায়নোজেন ও এক ভাগ হাইড্রজেন সংযুক্ত হইয়া ইহা উৎপন্ন করে।

ধর্ম্ম—ইহা বর্ণহীন তরল পদার্থ। ২৬০৫ অংশ তাপে ফুটিয়া উঠে এবং ১৫ অংশ শৈত্যে জমিয়া কঠিন হয়। গ্রীষ্মকালে ইহাকে তরল অবস্থায় রক্ষা করা দুঃসাধ্য। ইহার ঘ্রাণ দ্বারা শিরঃপীড়া ও মূর্চ্ছা ঘটিতে পারে। ইহার প্রকারবিশেষে তীক্ষ্ণ গন্ধ আছে। ইহার আস্বাদ প্রখর; কিন্তু অম্ল নহে। অধিক জলের সহিত না মিশাইয়া ইহার কোন প্রকার ব্যবহার করা উচিত নহে। ১০০ ভাগ জলে ৩ ভাগ মিশাইয়া ঔষধার্থে ইহা ব্যবহার করা যাইতে পারে; কিন্তু তেমন স্থলেও একবারে এক ফোঁটার অধিক কিম্বা বার বার দেওয়া যাইতে পারে না। ফলতঃ এই ঔষধের ব্যবহারে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত। অনভিজ্ঞ ভিষকের ইহা ব্যবহার করা উচিত নহে; এবং ইহা ঔষধালয় ভিন্ন বাসভবনে রাখা

উচিত নহে। এই বিষজন্য অনিষ্ট উৎপত্তি হইলে শীতল জল ব্যবহার দ্বারা তাহার প্রতীকার হইতে পারে। এই বিষ দ্বারা কুক্কুরাদি মৃতপ্রায় হইলে তাহাদের শরীরে শীতল জল প্রবল বেগে ঢালিয়া দিয়া তাহাদিগকে পুনর্জ্জীবিত করা গিয়াছে। এমোনিয়া আঘ্রাণ করিলেও এই বিষের তেজ মন্দীভূত হয়।

প্রস্তুত প্রণালী—পটাসিয়ম্ সায়নাইড্‌কে গন্ধক দ্রাবকের সহিত সংযুক্ত করিয়া বকযন্ত্রে চোঁয়াইবার সময় যাহাতে এই গ্যাস উড়িয়া যাইতে না পারে, সেইরূপ বন্দোবস্ত করা উচিত। ফলতঃ বিশেষ সাবধান হইয়া এই গ্যাস সংগ্রহ করিতে হয়; এবং প্রথম শিক্ষার্থীদিগের এ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করা কোনও মতে কর্ত্তব্য নহে।

ডাঃ সত্যপ্রিয় দত্ত।

স্বর্গীয় আনন্দমোহনের ঈশ্বর-ভক্তি।

কয়েক মাস হইল "প্রবাসীতে, শ্রদ্ধেয়া শ্রীমতী হেমলতা দেবী স্বর্গীয় আনন্দ মোহন বসুর জীবনী বর্ণনা করিতে করিতে লিখিয়াছেন—"ধর্ম্মের গৌরব যাঁহার হৃদয় স্পর্শ করিয়াছে, তিনি কখন আনন্দমোহন বসুর ভক্ত্যশ্রুপ্লাবিত অপূর্ব্ব মুখশ্রী বিস্মৃত হইবেন না।" আমরা আজ এই কথাটি লক্ষ্য করিয়া কিছু বলিতে চাই।

এ কথা সকলেই জানেন যে আজকাল গীতাগ্রন্থের বড় আদর; কারণ গীতার আদর্শ অতি উচ্চ। গীতার প্রধান শিক্ষা জ্ঞান, ভক্তি ও কর্ম্ম—এই তিনটীকেই চোখের সম্মুখে রাখিয়া জীবন গঠন করিতে হইবে। যেমন উদ্যানের বৃক্ষটি পত্র পুষ্প ও ফলে সুশোভিত হইলেই তাহার সৌন্দর্য্য বর্দ্ধিত হয় ও তাহার বৃক্ষ-জন্ম সার্থক হয়, তেমনি মানুষ যদি জ্ঞান ও ভক্তিলাভ করিয়া জীবনের মহৎ কার্য্য সম্পন্ন করিতে পারে, তাহা হইলেই মানব-জীবন সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হয় এবং দুর্ল্লভ নরজন্ম সার্থক হয়।

কিন্তু পত্র, পুষ্প ও ফল—একই সময়ে এই তিন বস্তুতে অতি অল্প বৃক্ষকেই সুশোভিত হইতে দেখা যায়। কোনও বৃক্ষের পত্র ও পুষ্প থাকে ত ফল থাকে না; আবার পত্র ও ফল থাকে ত পুষ্প থাকে না। সেইরূপ সংসারে জ্ঞান, কর্ম্ম ও ভক্তি-সমন্বিত মানুষ অতি অল্পই দেখিতে পাওয়া যায়। অনেকেরই জ্ঞান আছে, অনেকে সৎকর্ম্মও করেন; কিন্তু দুর্ল্লভ ঈশ্বরভক্তি তাঁহাদের জীবনে খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। আবার অনেক ধর্ম্ম-রসজ্ঞ ভাবুক লোকের অন্তরে ঈশ্বরভক্তি বিকশিত হইতে দেখা যায়, কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে গভীর জ্ঞান ও কর্ম্মস্পৃহা বড় বেশি দেখিতে পাওয়া যায় না।

আনন্দমোহনের জীবনে কিন্তু এই ত্রিবিধ ভাবেরই সমাবেশ হইয়াছিল। জ্ঞানের দিব্য-রশ্মিতে তাঁহার হৃদয় যেরূপ উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছিল, তেমনি সে হৃদয়ে ভক্তির ফুল প্রস্ফুটিত হইতে দেখা গিয়াছে এবং কর্ম্মেতে তিনি একজন কর্ম্ম-যোগী পুরুষ বলিয়াই গণ্য। এ বিষয়ে সংবাদপত্রে বিস্তর পড়া গিয়াছে; তাই আজ তাঁর ভক্তি সম্বন্ধেই দুএকটী কথা বলিব।

বহুবৎসর পূর্ব্বে আমরা কলিকাতায় মাঘোৎসব দেখিতে আসি। তাহার আগে কলিকাতা আসিয়াছি, কিন্তু ব্রাহ্ম সমাজের সঙ্গে যোগ ছিল না বলিয়া ব্রহ্মোৎসব দেখিতে যাই নাই। সে বার ব্রহ্মোৎসব দেখিতে আসিয়া কয়েকজন লোককে দেখিবার জন্ত ব্যাকুল হইয়া পড়িলাম। তাহার মধ্যে স্বর্গীয় প্রতাপ-চন্দ্র মজুমদার, স্বর্গীয় আনন্দমোহন বসু, পূজনীয় পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী এবং শ্রদ্ধা-স্পদ রবীন্দ্র বাবুর নাম করিতে পারি।

কলিকাতায় আমি যে বন্ধুর বাসায় উঠিয়াছিলাম, তিনি আমার ব্যাকুলতা দেখিয়া আশ্বাস দিলেন, আমি উৎসবের মধ্যেই এই চারিজন প্রসিদ্ধ ব্যক্তিকে দেখিতে পাইব। তাঁহার কথাই সত্য হইল। উৎসবের মধ্যে আমি প্রথম যে দিন সাধারণ সমাজের মন্দিরে প্রবেশ করিলাম, সেই দিনই শাস্ত্রী মহাশয়ের বক্তৃতা। বক্তৃতার মধ্যে শাস্ত্রী মহাশয়কে ত দেখিলামই; তা ছাড়া তাঁহার উত্তেজনাপূর্ণ বক্তৃতার এক একটি কথা যেন কামানের গোলার মত আসিয়া আমার মনের উপর পড়িতে লাগিল; আমার হৃদয়-দুর্গের চতুর্দ্দিকে কুসংস্কারের যে প্রাচীরটুকু ছিল, তাহা চূর্ণ হইয়া গেল।

তার পর একদিন স্বর্গীয় প্রতাপচন্দ্রের উৎসাহে যুবকদিগের একটি সভার উৎসব হইতেছিল; সেখানে প্রতাপচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ এই দুজনকেই দেখিতে পাইলাম। সে দিন প্রতাপচন্দ্রের সৌম্য ও প্রশান্ত এবং রবীন্দ্রনাথের সুন্দর মূর্ত্তি দেখিয়া এবং তাঁহার মুখে "বেঁধেছ প্রেমের পাশে ওহে প্রেমময়" এই সঙ্গীতটি শুনিয়া যে আনন্দ লাভ করিয়াছিলাম, তাহা আজিও পরিষ্কার মনে আছে।

কিন্তু অন্য সকলকেই দেখিলাম, স্বর্গীয় আনন্দমোহনকে ত কোথাও দেখিতে পাইলাম না। তাহার পর ১১ই মাঘ আসিল। সেদিন সূর্য্যোদয় হইতে না হইতেই আমরা ব্রহ্মমন্দিরে প্রবেশ করিলাম। মন্দিরে ভয়ানক ভিড়! সেই ভিড়ের মধ্যে সম্মুখে বসা ত দূরের কথা; কোন রকমে পশ্চাতের একটি আসনের একটুখানি জায়গা অধিকার করিয়া বসিলাম। তখন আনন্দমোহনকে দেখিতে পাইলাম। কি ভাবে তাঁহাকে দেখিলাম? দেখিলাম সেই সৌম্যমূর্ত্তি আনন্দমোহন বক্ষঃস্থলে দুখানি হাত রাখিয়া ঊর্দ্ধদিকে চাহিয়া আছেন; ভাবোচ্ছ্বাসে তাঁহার সুন্দর মুখকান্তি উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে;

তাঁহার নীলোৎপল নয়ন বহিয়া অশ্রুধারা ঝরিয়া যাইতেছে; তাঁহার পার্শ্বে উপবিষ্টা বালিকা কন্যা বিস্ময়-বিস্ফারিতলোচনে পিতার প্রেমোজ্জ্বল মুখশ্রীর বিচিত্রভাব নিরীক্ষণ করিতেছে। আমিও অনিমেষ-নয়নে আনন্দমোহনের মুখের পানে চাহিয়া রহিলাম; তাঁহার "ভক্ত্যশ্রুপ্লাবিত অপূর্ব্ব মুখশ্রী" দেখিয়া উপকৃত হইলাম; বুঝিতে পারিলাম, আনন্দমোহন শুধু কেম্ব্রিজের র‍্যাংলার নহেন, কেবল স্বদেশহিতৈষী ও রাজনীতিজ্ঞ নহেন, কেবল স্ত্রীশিক্ষার উৎসাহদাতা ও সমাজ-সংস্কারক নহেন; আনন্দমোহন একজন ভক্ত। তাঁহার হৃদয়ে ভক্তির উৎস লুক্কায়িত আছে, তাই এই উৎসবের ভগবৎ-আরাধনায় অন্তরের ভক্তিভাব নয়নে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছে।

ইহার পর কতবারই ত সাধারণ সমাজের মন্দিরে তাঁহার "ভক্ত্যশ্রুপ্লাবিত অপূর্ব্ব মুখশ্রী" দেখিয়া পুলকিত, বিস্মিত ও উপকৃত হইয়াছি। একবার মাঘোৎসবে সাধারণ সমাজের মন্দিরে স্বর্গীয় প্রতাপচন্দ্র উপাসনা করিয়াছিলেন। সেবার তাঁহার সুগভীর আরাধনায় এবং কবিত্ব ও দর্শনসংমিশ্রিত অপূর্ব্ব উপদেশে আমরা সকলেই কৃতার্থ হইয়াছিলাম! কিন্তু দেখিলাম উপদেশের সময় আনন্দমোহনের এরূপ ভাবোদয় হইয়াছে যে, তিনি আর বসিয়া থাকিতে পারিতেছেন না; উপদেশের মধ্যেই বুকের উপর দুখানি হাত রাখিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন!

আর একবার আমরা দার্জ্জিলিঙ্গে গিয়াছিলাম। তখন স্বর্গীয় বসু মহাশয় একটি পীড়িত সন্তানকে লইয়া দার্জ্জিলিং বাস করিতেছিলেন। দুঃখের বিষয় যে, তাঁহার সন্তানটির মৃত্যু হইল। অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়ার সময় আমরা অনেকেই বসু মহাশয়ের বাসায় গিয়া উপস্থিত হইলাম। আশ্বিনমাসের "প্রবাসী"র প্রবন্ধলেখিকা শ্রদ্ধেয়া হেমলতা দেবীও সেখানে উপস্থিত ছিলেন। ভুটিয়া স্কুলের তদানীন্তন হেডমাষ্টার শ্রীযুক্ত ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয় উপাসনা করিলেন। তার পর বসু মহাশয় স্বয়ং যখন প্রার্থনা করিতে লাগিলেন, তখন তাঁহার নয়ন শিশিরসিক্ত পুষ্পদলের ন্যায় ভক্তির অশ্রুতে আর্দ্র হইল; তাঁহার সেই "ভক্ত্যশ্রুপ্লাবিত অপূর্ব্ব মুখশ্রী" দেখিয়া আমাদের অন্তরও বিগলিত হইল।

এই ঈশ্বরভক্তিতেই বোধ হয় বসু মহাশয়ের প্রকৃতি অতিশয় মধুর হইয়াছিল। একে ত তাঁহার সুমিষ্ট মুখশ্রীরই কেমন একটা আকর্ষণ ছিল। তার পর তাঁহার হাস্যোজ্জ্বল মুখের মিষ্ট কথায় সকলকেই আকৃষ্ট হইতে হইত। একবার তাঁহার দমদমার বাটীতে মাঘোৎসবের উদ্যানসম্মিলন হইয়াছে। আমরা প্রায় তিন চারি শত পুরুষ ও স্ত্রীলোক তাঁহার মেহগ্নি গাছের তলায় বসিয়া গিয়াছি। প্রথম মেয়েরা সুমধুর কণ্ঠে সঙ্গীত করিলেন; পরে উপাসনা হইল। তার পর বসু মহাশয়কে কিছু বলিতে অনুরোধ

করা হইল। তাঁহার এমনই বিনয় ছিল যে, সহজে কোনও ধর্ম্মের কথা বলিতে চাহিতেন না। কিন্তু সেদিন সকলের অনুরোধে পড়িয়া কিছু বলিতে স্বীকৃত হইলেন। একটি জ্যোৎস্নারাত্রির বর্ণনা করিয়া, ঈশ্বরের সৌন্দর্য্যের কথা বলিতে লাগিলেন। তাঁহার উৎকৃষ্ট বর্ণনা শুনিয়া মনে হইল, তিনি বাঙ্গলাকাব্যের রসগ্রাহী পাঠক ছিলেন, নচেৎ বাঙ্গলা ভাষায় অমন সুন্দর করিয়া জ্যোৎস্নাময়ী যামিনীর সৌন্দর্য্য বর্ণনা করিতে পারিতেন না; এবং সেই বর্ণনা দ্বারা আমাদের চিত্তে সুনির্ম্মলা ভক্তির রসধারা উচ্ছলিত করিয়া তুলিতে পারিতেন না।

তাঁহার সুমিষ্ট প্রকৃতি সম্বন্ধে আর একটি কথা বলি। কলিকাতায় পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের সাধনাশ্রম প্রতিষ্ঠা হওয়ার পর, আমরাও গিয়া সেই আশ্রমে যোগদান করি। আমরা শাস্ত্রী মহাশয়ের সঙ্গে এক বাড়ীতে একসঙ্গেই বাস করিতাম। একবার স্বর্গীয় বসু মহাশয় শাস্ত্রী মহাশয়ের সঙ্গে আমাদিগকেও তাঁহার বাড়ীতে আহারের নিমন্ত্রণ করিলেন। আমরা লজ্জাবশতঃ ইহার পূর্ব্বে কথনো বসু মহাশয়ের সঙ্গে বিশেষ কথাবার্ত্তা বলি নাই। সে বার শাস্ত্রী মহাশয় আমাদিগকে বসু মহাশয়ের নিকটে লইয়া গিয়া আলাপ করাইয়া দিলেন। বসু মহাশয় আমাদিগকে কত মিষ্ট কথাই শুনাইতে লাগিলেন। আমরা যথন আহার করিতে বসিলাম, তথন ডাক্তার জগদীশচন্দ্র বসু মহাশয়ের পত্নী এবং আনন্দমোহন বাবুর জ্যেষ্ঠা কন্যা আমাদিগকে খাদ্যসামগ্রী পরিবেশন করিতে লাগিলেন। আমরা একদিকে যেমন উৎকৃষ্ট খাদ্যসামগ্রী দ্বারা রসনাকে পরিতৃপ্ত করিতে লাগিলাম, অন্যদিকে বসু মহাশয়ের সুললিত বাক্য শুনিয়া প্রচুর আনন্দলাভ করিতে লাগিলাম। এমন কি, কেহ যদি কৌতূহল বশতঃ আমাদিগকে জিজ্ঞাসা করেন,—সে দিন বসু মহাশয়ের বাড়ীর খাদ্যসামগ্রীই অধিক মিষ্ট, না তাঁহার কথা বার্ত্তাই অধিক মিষ্ট, তাহা হইলে সে কথার জবাব দেওয়া কিছু মুস্কিল হইয়া দাঁড়াইবে। কেন না, খাদ্যসামগ্রীও যেমন মিষ্টরসে পরিপূর্ণ ছিল, বসু মহাশয়ের কথাগুলিও তেমনি সুমিষ্ট বোধ হইয়াছিল;—এই দুই রকম মিষ্টতার তারতম্য করা বড় কঠিন।

আমরা আর একটি কথা বলিয়াই আমাদের বক্তব্য বিষয় শেষ করিব। আনন্দমোহন ব্রাহ্মসমাজের নিকট যে বার শেষ বিদায় গ্রহণ করেন, সে বারের কাহিনী বড় মর্ম্মান্তিক। গত মাঘোৎসবের পূর্ব্ব মাঘোৎসবের এক রবিবার অপরাহ্নকালে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের বার্ষিক অধিবেশন হইয়াছিল। সৌভাগ্যবশতঃ সেদিন আমরাও সেথানে উপস্থিত ছিলাম। সে বার বসু মহাশয়ই সমাজের সভাপতি ছিলেন। কিন্তু

পীড়িত ছিলেন বলিয়া সভার সকল অধিবেশনে উপস্থিত হইতে পারেন নাই। উক্ত দিবস তিনিই সভায় আসিয়া সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন। যখন সভাপতির বক্তৃতা করিবার সময় উপস্থিত হইল, তখন তিনি কিছু বলিতে চাহিলেন। ডাক্তার প্রাণকৃষ্ণ আচার্য্য মহাশয় সভায় উপস্থিত ছিলেন; তিনি বলিলেন বসু মহাশয়কে কিছুই বলিতে দেওয়া হইবে না, কারণ বসু মহাশয়ের যে পীড়া, তাহাতে বেশি কথা বলা একেবারে বারণ।

প্রাণকৃষ্ণ বাবুর কথা শুনিয়া বসু মহাশয় যেরূপ করুণস্বরে ও কাতরভাবে কিছু বলিবার অনুমতি ভিক্ষা করিতে লাগিলেন, তাহা স্মরণ করিলে এখনও চক্ষুতে জল আসে। তাঁহাকে মাত্র পনর মিনিট বলিবার সময় দেওয়া হইল। তিনি বলিতে লাগিলেন,—

"আপনাদের নিকট হয় ত আজই আমার শেষ বিদায়, আর যে কখনও এইরূপভাবে এই মন্দিরে আপনাদের সম্মুখে উপস্থিত হইব, আমার সে আশা আর নাই, শরীরের অবস্থা একেবারেই সেরূপ নয়। সেইজন্যই আজ আমি ডাক্তারের নিষেধ সত্ত্বেও মনের প্রবল আবেগে দু একটী প্রাণের কথা বলিবার জন্য আপনাদের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়াছি।" তৎপরে তিনি সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের আধ্যাত্মিক অবস্থা যাহাতে উন্নত হয়, সমাজের মধ্যে ভক্তির ভাব যাহাতে বর্দ্ধিত হয়, ব্রাহ্মদিগকে তদ্বিষয়ে পুনঃপুনঃ অনুরোধ করিতে লাগিলেন।

ইহার দুই দিন পরেই ১১ই মাঘ। সে দিন ব্রাহ্মসমাজ মন্দিরে, লোকে লোকারণ্য। আনন্দমোহন বাবু অন্তরের প্রবল আবেগে সেই ভিড়ের মধ্যেই সমাজে প্রবেশ করিলেন। প্রায় সমস্ত দিন মন্দিরের মধ্যেই রহিলেন। তাঁহার পত্নী এবং পুত্র কন্যাগণ তাঁহাকে মন্দির হইতে গৃহে লইয়া যাইবার জন্য বিস্তর চেষ্টা করিলেন; কিন্তু বসু মহাশয় হয় ত মর্ম্মের নিভৃততম স্থান হইতে এই বাণীই শুনিতে পাইয়াছিলেন যে, আর তাঁহার প্রিয় ব্রহ্মমন্দিরে আসিবার সুযোগ হইবে না, অদ্য তাঁহার প্রিয় মন্দিরে আসার শেষ দিন; তাই তিনি আত্মীয় স্বজনের অনুরোধও শুনিলেন না। কিন্তু আমরা ১১ই মাঘ বৈকালে লক্ষ্য করিলাম—তিনি যেন শ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছেন, তাঁহার হাত কাঁপিতেছে।

হায়! সেই ১১ই মাঘ রাত্রে গৃহে গমন করিয়াই যে রোগদ্বারা আক্রান্ত হইলেন, আর তাহার হস্ত এড়াইতে পারিলেন না, আর একটি বারও তাঁহার প্রিয় সমাজমন্দিরে আসার সুযোগ হইল না; তাঁহার কথাই সত্য হইল; সেই ৯ই মাঘের বিদায় গ্রহণই তাঁহার শেষ বিদায় গ্রহণ হইল।

তারপর যে দেড় বৎসর বাঁচিয়া-

ছিলেন, তাঁহার পত্নী সঙ্গীত করিতেন, আর তিনি বিছানায় পড়িয়া উপাসনা করিতেন। পীড়া বৃদ্ধি হইবার ভয়ে ব্রাহ্মগণ তাঁহার সঙ্গে দেখা করিতে যাইতেন না, ব্রাহ্মসমাজের কোন খবরও কেহ তাঁহাকে জানাইত না; তিনি সেজন্য কতই আক্ষেপ করিতেন। এই অবস্থায় একবার সাধনাশ্রমের পরিচারক শ্রীযুক্ত গুরুদাস চক্রবর্ত্তী মহাশয় তাঁহার সঙ্গে দেখা করিতে গিয়াছিলেন। বসু মহাশয় তাঁহাকে বলিলেন—"আমার পীড়া বৃদ্ধি হইবে বলিয়া কেহই আমার কাছে আসেন না; যে কয়েকদিন বাঁচিয়া থাকিব সে কয়দিনও যদি ধর্ম্মবন্ধুদিগের সঙ্গে ধর্ম্মালাপ করিতে না পারি, তবে বাঁচিয়া ফল কি?" গুরুদাস বাবুকে বলিলেন—তিনি পরলোকে গমন করিবার জন্য সম্পূর্ণরূপে প্রস্তুত হইয়াছেন, তাঁহার অন্তরে কোনও ভয় নাই।

এই সকল কথা ও ঘটনাদ্বারা আমরা কি প্রমাণ পাই? আমরা বুঝিতে পারি আনন্দমোহনের অন্তরে প্রকৃত ধর্ম্মবিশ্বাস ও ঈশ্বরভক্তি বিকশিত হইয়াছিল; তিনি জ্ঞানযোগ ও কর্ম্মযোগের ন্যায় ভক্তিযোগেও অনেক পরিমাণে সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন; তাঁহার এই জ্ঞান, কর্ম্ম ও ভক্তিসমন্বিত জীবন যথার্থই আমাদের অনুকরণের যোগ্য।

শ্রীঅমৃতলাল গুপ্ত।

মহাযাত্রা।

(২০এ আগষ্ট)

ঘোর তমসার রেতে একা দাঁড়াইনু
বৈতরণী এ পারেতে, যথা বেলাভূম।
লুণ্ঠিত কতই হলো এ অবশ তনু,
ভাবিলাম মায়া খেলা, ডাকি কোথা তুমি।
যবে ঘন অবিরল গোধূলি-ললাট,
জগৎ তমসাছন্ন, আলো নিভে গেল;
মরম দুয়ারে চির পড়িল কবাট,
অবরুদ্ধ এ নিভৃতে পশিবে না আলো।
বৈতরিণী এ পারেতে একাই কাঁদিব,
একাই বহিতে হবে দুর্ব্বহ জীবন,
অসীম এ মরুমাঝে একাই চলিব,
একা মাথা পেতে নিব অসহ্য দাহন।
অবশেষে মহাযাত্রা আসিবে যখন,
হাহাকার ঘুচে যাবে, পাইব সান্ত্বনা;
ধাইব বিভুর কোলে, লইব শরণ,
চিরশান্তি মাঝে ডুবি ভুলিব বেদনা।

শ্রীস্বর্ণপ্রভা বসু।

আতিথেয়তা।

(প্রাপ্ত।)

বর্ত্তমান সময়ে আমাদিগের দেশে অতিথি-সৎকার প্রথা বহুদিন হইতে তিরোহিত হইয়াছে। আদিম অতিথি-সেবার ব্যবস্থা যাহাতে পুনরায় প্রবর্ত্তিত হয়, তদ্বিষয়ে ভারতীয় নরনারীমাত্রেরই মনোযোগ দেওয়া একান্ত বাঞ্ছনীয়। অতিথিসৎকারই এককালে এদেশে একতার ভিত্তিস্বরূপ ছিল। এক দেশের অপরিচিত ব্যক্তির সহিত আতিথ্য-নিবন্ধন ভিন্নদেশীয় ব্যক্তির মিত্রতা স্থাপন হইত। সাময়িক আতিথ্যের সাদর যত্নে অনুপ্রাণিত হইয়া, পরস্পরে সাংসারিক, সামাজিক এবং দেশহিতকর সর্ব্ববিধ কার্য্যে পরস্পরকে সহায়তা করিতে পারিতেন। এইরূপে প্রীতি-প্রণোদিত হইয়া, পরস্পরে প্রয়োজনমত পরস্পরের সহানুভূতি লাভ করিতেন। প্রাচীন কালে গৃহস্থেরা সমাগত অতিথিকে দেবতা-সদৃশ পরিচর্য্যা করিতেন। অতিথি ব্রাহ্মণ হউন, ক্ষত্রিয় হউন, বৈশ্য হউন, অথবা শূদ্র হউন, কেহই জাতি-ধর্ম্ম বিচার করিতেন না। অভ্যাগত অতিথিগণ সেকালে তাঁহাদিগের নিকট নারায়ণ নামে অভিহিত হইতেন; সে বিষয় নিম্ন শ্লোকেই প্রতিপন্ন হইতেছে।

"উত্তমস্যাপি বর্ণস্য নীচোপি গৃহমাগতঃ।
পূজনীয়ো যথাযোগ্যং সর্ব্বদেবময়ো-
হতিথিঃ।"

অন্য স্থানে আছে :—

"সর্ব্বত্রাভ্যাগতো গুরুঃ।"

তাঁহারা অতিথিকে প্রত্যাখ্যান করা মহাপাপ বিবেচনা করিতেন। নিম্ন-শ্লোকে তাহার জাজ্বল্যমান প্রমাণ পাওয়া যায়।

"অতিথির্যস্য ভগ্নাশো গৃহাৎ
প্রতিনিবর্ত্ততে।
স তস্মৈ দুষ্কৃতং দত্বা পুণ্যমাদায় গচ্ছতি।"

কালের আবর্ত্তনে সমস্তই পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে। গৃহস্থগণ এখন অতিথি-সেবা হইতে বিরত হইয়াছেন। প্রবাসী ব্যক্তিগণও এখন গৃহস্থদিগের আবাসে আতিথ্যগ্রহণে লজ্জা ও অপমান বোধ করেন। কিন্তু অতি পুরাকালে পথশ্রান্ত প্রবাসী ব্যক্তি অকুণ্ঠিতভাবে গৃহস্থ-আশ্রয়ে অতিথি হইয়া, পরিচর্য্যালাভে শারীরিক যাবতীয় শ্রান্তি দূর করিয়া, অন্তরের অন্তস্তলে অনির্ব্বচনীয় আনন্দ অনুভব করিতেন। আমাদিগের পুরাণে তাহার ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত পরিলক্ষিত হয়। কত সসাগরা ধরার অধিপতি মুনি ঋষি-গণের পুণ্যাশ্রমে আতিথ্য লাভ করিয়া আপনাদিগকে কৃত কৃতার্থ জ্ঞান

করিতেন। আবার কত প্রবাসী মুনি ঋষি ও দীনদরিদ্র ব্যক্তিদিগকে রাজা ও রাজোয়ারাগণ স্বীয় প্রাসাদে আতিথ্য গ্রহণ করাইয়া আপনাদিগকে ধন্য মনে করিতেন। এক্ষণে সে প্রথা তিরোহিত হইয়াছে। আজকাল পরের কাছে অতিথি হইয়া সেবা যত্ন লাভ করা দূরে থাকুক, আত্মীয় কুটুম্বের আশ্রয়ে একরাত্রি যাপন করিবার মত একটু নির্দ্দিষ্ট স্থান পাওয়া অতি দুরূহ ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এই কারণে বর্ত্তমান সময়ে আমরা বিশ্বজনীন সম্মিলন ভাব বিস্মৃত হইয়া পৃথক্ পৃথক্ ভাবাপন্ন হইয়া পড়িয়াছি। আতিথেয়তার অভাবেই আমাদের জাতীয় একতার দৃঢ় বন্ধন যে সমূলে ছিন্ন হইয়া গিয়াছে, তাহা সর্ব্ববিষয়ে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়। এখন আমরা দারুণ অবনতির চরম সীমায় উপনীত। আমাদিগের আর্য্য পিতৃ-মাতৃগণ, অতিথি-সৎকার-ব্রত বিভিন্ন জাতি-সম্মিলনের মুখ্য উদ্দেশ্য জ্ঞানে সর্ব্বান্তঃকরণে তাহা পালন করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে আমাদের স্বার্থপরায়ণতায় আমরা অতিথি-সৎকার প্রথার নিগূঢ় তথ্য বিস্মৃত হইয়া, উহা হেয়জ্ঞানে পরিহার করিয়াছি। এক্ষণে অতিথি-সৎকারের কথা উত্থাপিত হইলে অনেকেই উল্লেখ করিয়া থাকেন, এই বিষম মহার্ঘতার দিনে অতিথি-সৎকার ব্রত পালন করা অসম্ভব। আর ইহাতে কোনও ফলোদয় হয় না, অনর্থক পরের নিমিত্ত সাংসারিক ব্যয় বৃদ্ধি করা হয় মাত্র। কিন্তু এই দারুণ মহার্ঘতার দিনে তাঁহারা স্ব স্ব বিলাসের নিমিত্ত যে অর্থ বৃথা ব্যয় করেন, সে ব্যয় কত সংক্ষেপ করিতে পারিয়াছেন? তাঁহারা অনুধাবনপূর্ব্বক বিবেচনা করিয়া দেখিলে সহজেই বুঝিতে পারিবেন, তাঁহাদিগের অনাবশ্যক বিলাসিতা হেতু যত অর্থ বৃথা অপব্যয় হয়, তদ্দ্বারাই পুনর্ব্বার অতিথি-সৎকার প্রথা পালন করা যাইতে পারে। যদি আমরা প্রত্যেক গৃহস্থ, আপনাপন বিলাসিতার মাত্রা সংযত করিয়া, সামর্থ্য অনুযায়ী অর্থ অতিথি-সৎকারে ব্যয় করি, তাহা হইলে আবার আমাদের জাতীয় একতা পুরাকালের ন্যায় দৃঢ়বদ্ধ হইতে পারে। ভারতীয় নরনারীর সমীপে আমার ঐকান্তিক সানুনয় নিবেদন, যাহাতে সেই পুণ্যময় অতিথি-সৎকার ব্রত পুনরায় ভারতের সর্ব্বত্র প্রচলিত হয়, তদ্বিষয়ে সকলে দৃঢ়সংকল্প হউন।

শ্রীমতী সুশীলা সুন্দরী মিত্র,
শোভাবাজার-রাজবাটী।

প্রতিজ্ঞা পূরণ।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)।

৬

একদিন দ্বিপ্রহরে লক্ষ্মী মন্দিরে বসিয়া দেবীপূজায় নিবিষ্ট ছিল, এমন সময়ে লক্ষ্মীর মাতুল রমানাথকে সঙ্গে করিয়া সহসা তথায় উপস্থিত হইলেন। লক্ষ্মী তখন ধ্যানমগ্না,—তাঁহাদের আগমন জানিতে পারিল না। মাতুল বলিলেন, "রমানাথ! এই লক্ষ্মী।" মধ্যাহ্নের রৌদ্রতপ্ত পথক্লিষ্ট রমানাথ দেখিল,—কাননের ছায়াস্নিগ্ধ মনোরম স্থানে যৌবনে যোগিনীর ভুবনমোহিনী প্রতিমা—ব্রহ্মচারিণীর পবিত্র অঙ্গ-কান্তিতে প্রফুল্ল মুখকমলে যেন শান্তি ও প্রীতি উছলিয়া পড়িতেছিল, সে লাবণ্যে যেন স্বর্গের সুষমা ঝরিতেছিল। এই করুণাময়ী দেবীমূর্ত্তি, এই কি রমানাথের অপরিণীতা পত্নী লক্ষ্মী? শ্রান্ত রমানাথ ভগ্নহৃদয়ে মন্দির-সোপানে বসিয়া পড়িল; ভাবিল, "আমার জন্যই লক্ষ্মী আজ যৌবনে যোগিনী, আমিই সাংসারিক ভোগৈশ্চর্য্য হইতে লক্ষ্মীকে বঞ্চিতা—নির্ব্বাসিতা করিলাম।"

মাতুলের আহ্বানে লক্ষ্মীর ধ্যানভঙ্গ হইল। মাতুল বলিলেন, "লক্ষ্মী! এই দেখ, রমানাথ আসিয়াছে, তোমার তপস্যা আজ পূর্ণ হইল। ওঠ মা, আজ আমরা তোমার অতিথি।" অতিমাত্র চমকিত ও বিস্মিত হইয়া লক্ষ্মী রমানাথের দিকে চাহিল, চারি চক্ষুর মিলনে উভয়ের মর্ম্মস্থল আলোড়িত হইয়া উঠিল। মুহূর্ত্ত পরে প্রকৃতিস্থ হইয়া লক্ষ্মী উঠিয়া মাতুল ও রমানাথকে প্রণাম করিল। বহুদিনের তপস্যালব্ধ চির-বাঞ্ছিত অতিথিকে আজ সহসা অভাবনীয়রূপে প্রাপ্ত হইয়া আনন্দের আতিশয্যে লক্ষ্মী আত্মহারা হইয়া পড়িল। ক্ষুদ্র কুটীরে সে সাধ্যানুসারে আপন ইষ্ট দেবতার অতিথি-সৎকার করিল।

শ্রান্তি দূর হইলে লক্ষ্মীর মাতুল ইন্দু-ভূষণের পিতার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলেন। তখন নির্জ্জন কাননের নিস্তব্ধতার মধ্যে লক্ষ্মী ও রমানাথের নিভৃত সাক্ষাৎ হইল। উভয়ের হৃদয় কাঁপিতেছিল, উভয়েই বহুযত্নে উচ্ছ্বসিত হৃদয়াবেগ দমন করিয়া রাখিতেছিল। বহুক্ষণ রমানাথকে নির্ব্বাক্ দেখিয়া লক্ষ্মী আর থাকিতে পারিল না, সবিনয়ে জিজ্ঞাসা করিল "মাসীমা কেমন আছেন? এতদিনের পর কি আমার কথা তাঁর মনে পড়িল?" সেই স্বর রমানাথের মর্ম্মভেদ করিল। অপরাধী রমানাথ কি উত্তর দিবে ভাবিয়া পাইল না। সে কেমন করিয়া বলিবে যে, লক্ষ্মী তোমার চিন্তায় জর্জ্জরিত হইয়া

আজ তিনি মৃত্যুশয্যায় শয়ান এবং সে পাষণ্ডের মত আর একটা বিবাহ করিয়া মাতাকে সত্যভ্রষ্ট করিয়াছে। রমানাথের তৎকালীন মানসিক যন্ত্রণা অসহনীয় হইয়া উঠিল। সে অধীরভাবে সমস্ত ঘটনা সংক্ষেপে জানাইয়া স্বকৃত অপরাধের মার্জ্জনা ভিক্ষা করিল। শুনিয়া লক্ষ্মীর প্রফুল্ল মুখকান্তি ক্ষণেকের জন্য রক্তহীন বিবর্ণ হইয়া গেল। রমানাথ আবার বলিল "লক্ষ্মী! তুমি কি আমার সঙ্গে যাইবে না? আমার দোষ কি ক্ষমা করিবে না লক্ষ্মী?" নিমেষের মধ্যে আত্মসংযম করিয়া মধুর হাস্যের সহিত লক্ষ্মী উত্তর করিল, "মাতৃ আজ্ঞায় আমি তোমাকে এতদিন পতিরূপে পূজা করিতেছি, আজীবন পতিরূপেই তোমার আরাধনা করিব। তোমার কোনও দোষ গ্রহণের অধিকার আমার নাই, যাহা হইয়াছে, ভবানীর কৃপায় সমস্তই মঙ্গল হইবে। আমার জন্য তোমরা কেহ আর অনুতাপ করিও না। আমি সংসারের কোলাহল হইতে দূরে থাকিয়া পরম সুখে ও আনন্দে আছি, ভোগ-বিলাসের সাধ এখন আর আমার কিছুমাত্র নাই। আমি তোমার সহিত যাইব, আমার স্নেহময়ী মাসাকে একবার জন্মের মত শেষ দর্শন করিয়া আসিব।" লক্ষ্মীর মধুর স্বরে রমানাথের ক্ষত হৃদয়ে যেন অমৃতবর্ষণ হইল। দুর্ভাগ্য রমানাথ ভাবিল, হায়! দুই বৎসর আগে কেন লক্ষ্মীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলাম না? রত্নালঙ্কারভূষিতা, বিলাসচাঞ্চল্যময়ী সুন্দরী হেমলতার মোহিনী প্রতিমা ঢাকিয়া, ক্ষণকালের জন্য রমানাথের মনোমন্দিরে ব্রহ্মচারিণী লক্ষ্মীর শান্তিময়ী, করুণাময়ী মূর্ত্তি দেবীমহিমায় উজ্জ্বল হইয়া উঠিল।

সেই দিনই সন্ধ্যাকালে রমানাথ লক্ষ্মী ও তাহার মাতুলকে সঙ্গে লইয়া স্বদেশাভিমুখে প্রস্থান করিল।

৭

বাসন্তীর আর জীবনের আশা নাই, তারিণী বাবু যথাসাধ্য পত্নীর চিকিৎসা করাইলেন, কিন্তু দুঃসাধ্য প্রাণান্তক ব্যাধি কিছুতেই উপশমিত হইল না। কেবল লক্ষ্মী ও রমানাথকে দেখিবার আশায় এখনও বাসন্তীর দেহে প্রাণ আছে। সর্ব্বক্ষণ বাসন্তী জ্ঞানে অজ্ঞানে, জাগ্রতে স্বপনে লক্ষ্মীর নাম উচ্চারণ করিতেছিলেন। তারপর যখন লক্ষ্মী ও রমানাথ আসিয়া মুমূর্ষু বাসন্তীর চরণপ্রান্তে দাঁড়াইলেন, তখন বাসন্তী বহুক্ষণ নির্নিমেষলোচনে লক্ষ্মীর প্রতি চাহিয়া রহিলেন। অশ্রুপূর্ণনয়নে আর্দ্র কণ্ঠে রমানাথ কহিল "মা! এই তোমার লক্ষ্মীকে আনিয়াছি, আর কিরূপে আমি আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিব, বল মা?" বাসন্তী ক্ষীণ হস্ত প্রসারণ করিয়া পুত্রকে নিকটে বসাইয়া সস্নেহে আশীর্ব্বাদ করিলেন। তারপর অতি আদরে অতি স্নেহভরে লক্ষ্মীকে নিকটে ডাকিয়া বলিলেন, "এস মা, আমার

গৃহলক্ষ্মী! তোমার অভাবে আমার সোণার সংসার শ্রীভ্রষ্ট হইয়া গেল। পাতকিনী আমি, সরলা বালিকা তোমার পবিত্র জীবনের সকল সুখ সাধ হরণ করিয়া তোমাকে যৌবনে যোগিনী সাজাইলাম, মরণেও মা! আমি এ অনুতাপ-যাতনা হইতে মুক্তি পাইব না। তুমি আমায় ক্ষমা কর, মা লক্ষ্মী! নহিলে অনন্তকাল নরকের আগুনে জ্বলিয়া মরিব, আমি সত্য পালন করিতে পারিলাম না।" কাঁদিতে কাঁদিতে লক্ষ্মী বলিল, "মাসীমা, অমন কথা বলিও না। তুমি পুণ্যবতী, ভগবান্ তোমার আত্মার শান্তি বিধান করিবেন। আমার জন্য তুমি কিছুমাত্র দুঃখ করিও না, মাসীমা! তোমার কৃপায় আমি মুক্তির পথ প্রাপ্ত হইয়াছি, সংসারের ভোগে আর আমার কিছুমাত্র আসক্তি নাই, আমি অতুল আনন্দে কাল কাটাইতেছি; তুমি শান্ত হও, আশীর্ব্বাদ কর, এইরূপ শান্তিতেই যেন আমি অবশিষ্ট জীবন অতিবাহিত করিতে পারি।" বাসন্তীর কোটর-প্রবিষ্ট নয়ন হইতে দরদর ধারে অশ্রুধারা বিগলিত হইতেছিল, তিনি অতিকষ্টে একবার উঠিয়া বসিলেন। তৎপরে রমানাথের হস্তে লক্ষ্মীর হস্ত প্রদান করিয়া স্নেহার্দ্রস্বরে বলিলেন "বাবা রমানাথ! লক্ষ্মীকে আমি তোমার হস্তে প্রদান করিলাম, আজীবন তুমি এই সুবর্ণ প্রতিমাকে সমাদরে রাখিয়া মাতার অন্তিম অনুরোধ পালন করিও।" তারপর বাসন্তী স্বামীর চরণ স্পর্শ করিয়া কহিলেন, "তোমার বিনা অনুমতিতে আজ আমি লক্ষ্মীর সহিত রমানাথের বিবাহ দিয়া সত্যপালন করিলাম, দেবতা! এই মৃত্যুকালে আমার সকল অপরাধ মার্জ্জনা কর, নহিলে দাসীর গতি হইবে না।" সাধ্বী ভার্য্যার অন্তিমের কাতর প্রার্থনা নিষ্ঠুর গম্ভীরপ্রকৃতি তারিণী বাবুকে বিচলিত করিল। তিনি এখন বুঝিয়াছেন, পত্নীর জীবনব্যাপী বিষাদ ব্যাকুলতার হেতু তিনিই, তাঁহারই নিষ্ঠুরতার ফলে আজ বাসন্তীর জীবনসংশয়। প্রবল অনুতাপে তারিণী বাবুর হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যাইতেছিল। কম্পিত ক্ষীণকণ্ঠে আবার বাসন্তী বলিলেন, "আমার যাহা কিছু ধন ও অলঙ্কারাদি আছে, সমস্তই লক্ষ্মীকে দিলাম; মা লক্ষ্মী! তুমি আমার রমানাথকে ক্ষমা করিও, আশীর্ব্বাদ করি উভয়ে সুখী হও।" লক্ষ্মী ও রমানাথ একত্র মাতৃচরণে প্রণাম করিলেন।

তারিণী বাবু পত্নীর সন্তোষের নিমিত্ত সেই দিনই গোধূলীলগ্নে লক্ষ্মী ও রমানাথের যথাশাস্ত্র বিবাহ দিলেন। সেই দিনই নিশীথরাত্রে বাসন্তীর পবিত্র দেহ পঞ্চভূতে মিলিত হইয়া গেল।

তারপর লক্ষ্মী মাতুল সমভিব্যাহারে আপনার শান্তিকুটীরে ফিরিয়া গেল। তাহার ধনসম্পদের স্পৃহা নাই। লক্ষ্মী বাসন্তীর প্রদত্ত সমস্ত ধন ও অলঙ্কারাদি হেমলতাকে দান করিয়া গেল।

শ্রীমতী সুশীলাবালা দেবী।

কাল।

এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের ক্ষুদ্র ও মহৎ সকল জীবই কালের অধীন হইয়া সংসারের ধর্ম্ম রক্ষণ ও পরিচালন করিতেছে। এই ধর্ম্ম নিত্য ও নৈমিত্তিক এবং জীবের জন্মকাল হইতেই আরব্ধ।

কিন্তু প্রতি মুহূর্ত্তে এই কালরূপী মহা রাক্ষসের কার্য্যকলাপ প্রত্যক্ষ করিয়া আমরা আশ্চর্য্য ও ভীত হই।

জ্যেষ্ঠ পাণ্ডব বনবাসকালে যম কর্ত্তৃক অনেকগুলি প্রশ্ন দ্বারা পরীক্ষিত হইয়াছিলেন, তন্মধ্যে 'জগতে সর্ব্বাপেক্ষা আশ্চর্য্য কি?' ইহাও ছিল। প্রাজ্ঞ যুধিষ্ঠির এই সর্ব্বপ্রাণ-সংহারক মৃত্যুকে লোকে দেখে না, ইহাই আশ্চর্য্য বলিয়া জ্ঞাপন করেন।

এই মৃত্যুই এই রমণীয় জগতের অসারতা ও নশ্বরতা সুস্পষ্ট দেখাইয়া দেয়, আমাদের অন্তস্তলের সুদৃঢ় স্নেহবন্ধন পৃথিবীতে ছিন্ন করে ও শোকের বিষাদময়ী কৃষ্ণমূর্ত্তি ঘোরতর আকারে চিত্রিত করে। মৃত্যুর অনিবার্য্যশক্তি দেখিলে যতই পাষাণ হৃদয় হউক না কেন, ভীত ও বিকম্পিত হইয়া উঠে। পরম জ্ঞানীর চক্ষেও মৃত্যু বিরহ-অশ্রুকণা প্রকটিত করে। মৃত্যুর করাল কবল হইতে কাহারও নিষ্কৃতি নাই। সময়ে অসময়ে, স্থানে, অস্থানে ইহার সর্ব্বত্র গতি। জগতে যদি মৃত্যুর আধিপত্য না থাকিত, তবে রোগ-শোক-জরাক্লিষ্টের শান্তি কোথায় হইত? তাই বুঝি বিধাতা সর্ব্ববিধ্বংসকারী মহাকালকে অবনীতে প্রেরণ করিয়াছেন।

কিন্তু আমরাত মৃত্যুর ছায়াকে মহা অমঙ্গলকারী জ্ঞান করি। যখন অকালে মাতার ক্রোড় হইতে পুত্র, পত্নীর হৃদয় হইতে স্বামী, ভগিনীর প্রাণ হইতে ভ্রাতা, সন্তানের স্নেহ হইতে পিতা মাতাকে বিচ্যুত করিয়া অকালে তাহাদিগকে শোকসাগরে নিক্ষিপ্ত করেন, তখন কায়মনোবাক্যে এই মহা ভীষণ মৃত্যুর উচ্ছেদ প্রার্থনা না করিয়া থাকিতে পারি না। প্রিয়জনের বিয়োগে আমরা সৃষ্টির কঠোর নিয়ম সহ্য করিতে পারি না। কিন্তু বিধাতার নিয়ম অখণ্ড ও অপরিবর্ত্তনীয়। মানবচিত্ত স্বার্থপর—মায়াশীল। নিজের শরীর মন ও আত্মার তুষ্টি পুষ্টি সাধন ইহার উদ্দেশ্য। পৃথিবীতে থাকি আর স্বর্গেই যাই, আপন সুখসাধন জীবের প্রধান কার্য্য। দান ধর্ম্ম কর্ম্ম সমুদয় স্বীয় সুখের জন্য। ভগবানে চিত্তার্পণ—তাহাও স্বকীয় মোক্ষপ্রাপ্তির জন্য। তাই জগতে আপনাকে লইয়া এত সুখ ও দুঃখ, এত হাহাকার। যে বস্তুটি লইয়া আমার সুখ, তাহার অভাবেই পীড়া। সেই জন্য সংসারে বিধাতা মায়াবন্ধন

গ্রথিত করিয়া একজনকে অপরের সহিত সংযুক্ত করিয়াছেন, এই মায়াই সুখ দুঃখের সহচরী। "কাল" যখন আসিয়া জীবের প্রতি কটাক্ষ করে, মায়া স্বীয় সুকুমার অঞ্চলে তাহাকে আচ্ছাদিত করিতে চায়।

আমরা নিশ্চিত, নিরুপায় ও ধ্রুব সত্য জানিয়া এত আকুল হই কেন? মরমের অন্তস্তল হইতে বেগে প্রবাহ ছুটিতে থাকে, জ্বালাময় অন্তর্দ্দাহ কোটি কোটি শিখা প্রজ্বলিত করিয়া দেয়। সৃষ্টির বিধান গ্রাহ্য করিতে সমর্থ হই না, বিধাতাকেও চিনিতে পারি না। তাই কালের বিভীষিকাময়ী মূর্ত্তি এত নিদারুণ দেখি। যদি মানবের অন্তঃকরণ সেই সর্ব্বনিয়ন্তার কার্য্যের অখণ্ড প্রভাব হৃদয়ে ধারণ করিতে পারে, তাহা হইলে আর কালের গতি বলিয়া পরিতাপ ঘটে না—প্রভুর আজ্ঞা বলিয়া শোক করিবার কারণ থাকে না। কিন্তু মায়া আসিয়া মোহিনী মূর্ত্তি ধরিয়া ভুলাইয়া দেয়। তাই আমরা অন্ধ ও অজ্ঞান হইয়া তাহা দ্বারা পরিচালিত হই। কালের গতিবিধি কেহই নিরীক্ষণ করিতে পারে না, তাহার প্রভাবই কেবল পরিলক্ষিত হয়।

নিরাকার হস্তপদবিহীন কাল অলক্ষ্যে আসিয়া বিরলে বিরলে আপনার কার্য্য করে। মর্ম্মে মর্ম্মে মানব সেই গুপ্তাঘাত ভোগ করেন। সে ব্যথা নয়নের দৃশ্য নহে, বাক্যেরও বর্ণনীয় নহে; শুধু মানস ইন্দ্রিয়দ্বারা অনুভূত হয়। আর দুঃখের বেদনা কেবল অশ্রুজল হইয়া বক্ষঃস্থল প্লাবিত করে। কালের আঘাত কালেই মন্দীভূত হয়, তথাপি এককালে নির্ম্মূল হয় না। সেই ঘোরকৃষ্ণময়ী রেখা চিতাশয্যায় চিতাবহ্নির সহিত দগ্ধ হইয়া ধূমরূপে গগনমণ্ডলে ওতপ্রোতভাবে বিরাজিত থাকে। ইহার ঔষধ মায়ার ভাণ্ডার এ সংসারে নাই। তবে যদি আমরা ইহলোকের দৃশ্যবস্তুর জ্ঞান ছাড়িয়া পরলোকের বিষয় দেখিতে চেষ্টা করি, তাহা হইলে শান্তির শীতল ছায়া দূরে প্রতিভাসিত হইবে।

আষাঢ়ের চাঁদ।

কেন গো বিষাদে লুকায়ে বদন
রয়েছে চন্দ্রমা! নীরদ-মাঝ?
মধুর আননে নাহিক সে হাসি,
বল কি বেদনা হৃদয়ে আজ?

নয়ন আসারে তিতিছে বসুধা,
ভ্রমিছ আঁধারে মলিন বেশে,
প্রেম-পাগলিনী কুমুদিনী পানে,
কেন না চাহিছ মধুর হেসে?

কোথা সে তোমার কৌমুদী বসন?
নক্ষত্রভূষিত সুন্দর মুখ?
কোথায় লুকাল সে চারু সুষমা!
হেরিয়ে তোমারে বিদরে বুক।

বিপদে তোমায় কেহ না সম্ভাষে,
চকোর চকোরী নাহিক পাশে।
উদাস পরাণে ভ্রমিছ একাকী।
সম্পদে সবাই নিকটে আসে।

বুঝেছি বুঝেছি নিয়তি-পীড়নে,
চিরস্থায়ী কোথা নাহিক সুখ।
আজি সেই রাজা—কাল সে ভিখারী,
তাইত তোমার এতেক দুখ।

শ্রীমতী সরলাসুন্দরী মিত্র।

অদ্ভুত গোদোহন।



উপরে কিসের ছবি দেখিতেছ? একটা প্রকাণ্ড গরুকে দুইজন বলবান্ পুরুষ শিং ও লেজ ধরিয়া দুই বিপরীত দিকে এমন জোরে টানিয়া ধরিয়াছে যে,

তাহার নড়িবার চড়িবার সাধ্য নাই। আর এক ব্যক্তি এক প্রকাণ্ড পাত্র লইয়া ঐ গরুর দুগ্ধ দোহনে নিযুক্ত। সে এমন করিয়া দুহিতেছে যে, সব শুষিয়া লইবে, ছিটা ফোঁটা দুধও রাখিবে না। দুধ সকলি তাহার প্রাপ্য, বলবান্ দুইটি লোক গাভীর অধিকারী হইয়াও দুগ্ধদোহনের সাহায্য করিতেছে। এই দোহনে গাভী ক্রমে শীর্ণ ও মৃত হইয়া যাইতে পারে এবং তাহাতে দোহনকর্ত্তার কোনও ক্ষতি নাই, সাহায্যকারিদ্বয়েরই সম্পূর্ণ ক্ষতি। কিন্তু তাহারা দুইজন পরস্পরের প্রতি রাগান্ধ, এইজন্য আপনাদিগের হিতাহিত বুঝিতে পারিতেছে না। যখন গরুটী নিতান্ত রক্তহীন হইয়া মুমূর্ষু হইবে, তখন তাহাদের চৈতন্য হইবে, কিন্তু তখন গরুকে বাঁচাইবার আর উপায় থাকিবে না।

পাঠকপাঠিকাগণ! এই চিত্রের প্রকৃত মর্ম্ম কি বুঝিয়াছেন? একটু অনুধাবন করিয়া দেখুন। গাভীটির অর্থ দুই ভ্রাতার পৈতৃক বিষয় সম্পত্তি। ইহা লইয়া তাহাদিগের পরস্পরের মধ্যে বিবাদ উপস্থিত হওয়ায় তাহারা আদালতের শরণাপন্ন। উভয়েরই জিদ্ পরস্পরকে হারাইবে। এক বুদ্ধিমান্ এটর্ণী এই সুযোগ পাইয়া উভয়কে খুব দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া থাকিতে বলিতেছেন এবং নিজে যথেষ্ট ফি (fee) আদায় করিয়া লইতেছেন। সম্পত্তির অধিকারীরা যত দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া মকর্দ্দমা চালাইতেছেন, এটর্ণী ততই সম্পত্তি দোহন করিয়া অর্থ শোষণ করিতেছেন। অবশেষে মকর্দ্দমা-খরচেই ধনী দুই ভ্রাতা সর্ব্বস্বান্ত হইলেন, এটর্ণীর পেট ভরিল। ইঁহারা আপোষে বিবাদের মীমাংসা করিলে এবং ভাই বলিয়া পরস্পরের প্রতি ক্ষমা প্রদর্শন করিলে এ দুর্গতি ঘটিত না—তাঁহাদের সম্পত্তি বজায় থাকিত এবং পরস্পরের প্রতি সদ্ভাবও রক্ষা পাইত।

আদালতের মোহজালে পড়িয়া কত বনিদি রাজসংসারও নষ্ট হইয়া গিয়াছে। মকর্দ্দমাপ্রিয় ধনিগণ ইহা হইতে যেন বিশেষ শিক্ষালাভ করেন।

বঙ্গ মহিলার হিমালয় ভ্রমণ।

(৫২৬ সংখ্যা—৫৯ পৃষ্ঠার পর)।

আমাদের সঙ্গে একজন বুদ্ধিমান্ পাহাড়ী ছিল, রাত্রির অবস্থানের উপযুক্ত একটী স্থান দেখিবার জন্য তাহাকেই অগ্রে পাঠান গেল। ক্রমে সন্ধ্যা হইয়া আসিল, আমরা ক্রমেই ঘোর দুর্গম পথে প্রবেশ করিলাম। পথ বলা যাইতে পারে, এমন

কিছুই নাই। বর্ষার জলে ধৌত হইতে হইতে স্থানে স্থানে গভীর গর্ত্ত হইয়াছে। কখন তাহাতে পড়িয়া প্রকাণ্ড বৃক্ষের মূল অবলম্বনে উপরে উঠিতেছি। স্থানে স্থানে ভীমকায় বৃক্ষ পড়িয়া রহিয়াছে, আমরা কখনও লম্ফ দিয়া, কখনও নীচের সুড়ঙ্গের পথে হামা গুড়ি দিয়া চলিতেছি। কাপড় জুতা ছিঁড়িয়া খণ্ড খণ্ড হইতেছে। সহযাত্রী একটী মহিলা নিতান্ত ক্লান্ত হইয়া পড়িলেন, কোন মতেই চলিতে পারেন না। তাঁহার সঙ্গে ৩ জন যাত্রী পশ্চাতে রহিলেন। ৩ টী মহিলা পূর্ব্বেই অগ্রসর হইয়াছেন। আমি ডাণ্ডি-ওয়ালা-গুলিকে লইয়া সেই বনপথে চলিতেছি। যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াও ডাণ্ডিওয়ালাদের সঙ্গে চলিতে পারিলাম না। তাহারা অনেক আগে চলিয়া গেল। কত ডাকিয়া উত্তর পাই না। সেই নিবিড় জঙ্গলে আমি একাকিনী জঙ্গল ভেদ করিয়া দক্ষিণে কি বামে অগ্রসর হইব জানি না। এখন গৃহে বসিয়া সেই অবস্থা ভাবিতে ভাবিতে কম্পিত হইতেছি, কিন্তু তখন মনে এমন এক অপূর্ব্ব সাহস জন্মিয়াছিল যে, তাহার বলে এই প্রতিকূল অবস্থাতেও বিচলিত হইয়া পড়ি নাই। দিবসেও যে দুর্গম পথে চলা ভার, রাত্রির অন্ধকারে সে পথে কি কষ্টে একা চলিতেছি,তাহা বর্ণনীয় নহে। একটু শব্দ শুনিলেই আশঙ্কা হয় যে, হয় ত বা ভালুক আসিতেছে। ভালুকের দৌরাত্ম্যের অনেক গল্প শুনিয়াছিলাম, তাই ভালুকের কথা মনে পড়িতেছিল। ২।৩ মাইল এই ভাবে চলিতে চলিতে অগ্রগামী মহিলাদের সাক্ষাৎ লাভ করিয়া যেন মৃতদেহে জীবন পাইলাম। রাত্রিটা এই ঘোর জঙ্গলে বন্যজন্তুদের সহিত কাটাইতে হইবে ভাবিতেছি। পথশ্রমে এতই ক্লান্ত যে,আর অগ্রসর হইবার ক্ষমতা নাই, তথাপি সহযাত্রী মহিলাদের আশা-জনক কথা শুনিয়া ধীরে ধীরে চলিলাম, ঘোর অন্ধকারে কোথায় যাইয়া পড়িব,ঠিক্ নাই। হঠাৎ দূরের আলোক দৃষ্টে প্রাণে নূতন আশার সঞ্চার হইল। আমাদের লোকেরাই যে বুদ্ধি করিয়া লণ্ঠন জ্বালিয়া আনিতেছে, তাহাতে বিশেষ কৃতজ্ঞ হইলাম। পশ্চাতের যাত্রীদের জন্য উদ্বিগ্ন হইলাম। একটী লণ্ঠন দিয়া ৩ জন লোককে তাঁহাদের অনুসন্ধানে পাঠান গেল। এদিকে আলো হস্তে লইয়া আমরাও অগ্রসর হইতেছি। সম্মুখে একটু সমতল ভূমি দেখিয়া তথায় রাত্রি কাটাইব স্থির করিয়া কম্বল পাতিয়া বসিলাম। সহযাত্রী মহিলাগণ তখনও আশ্রয়স্থান পাইবার আশা ত্যাগ করেন নাই। তাঁহারা কতকদূর যাইয়াই আমাকে আহ্বান করিলেন। এত ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছি যে, উঠিতে ইচ্ছা হয় না ; তথাপি অগ্রসর হই-লাম। একটী ভুটীয়া রমণী সহাস্য মুখে হাত বাড়াইয়া অভ্যর্থনা করিয়া আমা-দিগকে তাহার বাঁশের কুটীরে লইয়া গেল। অপ্রত্যাশিত আতিথ্যলাভ করিয়া অবাক্ হইলাম। গৃহখানি কেবল বাঁশে গঠিত, অধিকাংশ স্থান শস্যে পূর্ণ। বসিতে

স্থান পাইয়া যে আরাম বোধ হইল, বলিবার নহে। এখন পশ্চাদ্বর্ত্তী সহযাত্রীদের জন্যই যত চিন্তা হইতেছে। প্রায় এক-ঘণ্টার পর সকলেই নিরাপদে আসিয়া পঁহুছিলেন। দীর্ঘকাল পরে আত্মীয়দের সহিত সাক্ষাৎলাভে যত'না আনন্দ জন্মে, ৯ জন সহযাত্রী একত্রিত হইয়া তদপেক্ষা আনন্দিত হইলাম। এত ক্লান্তির মধ্যে আহার-চিন্তা আসিল না। শয়নের একটু স্থান পাইলেই কৃতার্থ হই। আশ্রয়দায়িনী ভুটীয়া নারী আমাদিগকে সুখী করিতে কত ব্যস্ত! মুখ ধুইবার জল ঢালিয়া দিতেছে। আহারের কথা বারবার জিজ্ঞাসা করিতেছে, যেন আমরা কুটুম্বভাবে আসিয়াছি। আমরা প্রথমে আহারের অনিচ্ছা জানাইলাম, সে কিছুতেই ছাড়িবে না। অবশেষে ৬ সের আলু সিদ্ধ ও ৩ সের চমরী গরুর দুধ আনিয়া দিল। সঙ্গে কিছু মাখন সম্বল ছিল, তাহার সাহায্যে সেই সিদ্ধ আলু যে তৃপ্তির সহিত আহার করা গেল, বর্ণনা করিতে পারি না—রাজভোগেও এত তৃপ্তি হয় না। এখন শয়নের ব্যবস্থায় ব্যস্ত হইলাম। একখানা কম্বল ঝুলাইয়া কুটীরের সেই সঙ্কীর্ণ স্থান দুই ভাগ করা গেল এক অংশে পুরুষগণ ও অন্য অংশে আমরা ৬টী মহিলা আশ্রয় লইলাম। পথের কথা বলিতে বলিতে আমাদের মধ্যে হাসির লহরী উঠিল। আজ জীবনের একটী স্মরণীয় দিন। যে নূতন অবস্থায় পড়িয়াছি তাহা চিন্তা করিতে করিতে একবারও নিদ্রা আসিল না। কলিকাতার পিঞ্জরাবদ্ধ পাখী হিমালয়ের ঘোর জঙ্গলে ভুটীয়া-গৃহে আতিথ্য গ্রহণ করিব, কল্পনাতেও ভাবিতে পারি নাই। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ যে, এই প্রতিকূল অবস্থাতেও মন নির্জ্জীব হইয়া পড়ে নাই, বরং নূতন অভিজ্ঞতা লাভ করিয়া আনন্দিত হইতেছি।

(ক্রমশঃ)

শ্রীস্বর্ণপ্রভা বসু।

নূতন সংবাদ।

১। অজিত সিং অমৃতসরে লুক্কায়িত ছিলেন, ধরা পড়িয়াছেন। তাঁহাকে দেশান্তরিত করা হইয়াছে।

২। জাপানে টোকিও শিল্পপ্রদর্শনী মহা সমারোহে সম্পন্ন হইতেছে। দর্শনী কি দশ পয়সা মাত্র। প্রতিদিন ৫০ সহস্র দর্শকের সমাগম হইতেছে।

৩। বিলাত-ভ্রমণকারী বিকানীর ও আলোয়ারের মহারাজা এবং গণ্ডোলের ঠাকুর ইণ্ডিয়া আফিসে অভ্যর্থিত হইয়াছেন।

৪। বিগত ১৯ শে জুন রাত্রিকালে বরিশালে ভীষণ বাত্যা হইয়া গিয়াছে। ঝড় অতি প্রবল বেগে বহিয়াছিল এবং প্রায় বার ঘণ্টাকাল স্থায়ী হইয়াছিল। ঝড়ের প্রকোপে অনেক বড় বড় গাছ ও বাড়ী ভূমিসাৎ হইয়া গিয়াছে।

৫। মহীশূরের ভূতপূর্ব্ব চীফ জজ ও অস্থায়ী দেওয়ান টি. আর, এ, শম্ভু সেটী, সি আই ই, মহাশয় ৭০ বৎসর বয়সে মানবলীলা সম্বরণ করিয়াছেন।

৬। বিগত ২৪শে জুন, সোমবার, কলিকাতা সহরে এবং তন্নিকটবর্ত্তী স্থানসমূহে ভয়ঙ্কর ঝড় বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। ঝড়ে অনেক বড় বড় গাছ সমূলে উৎপাটিত হইয়া গিয়াছে। গাছ পড়িয়া তার কাটিয়া যাওয়াতে কোন কোন রাস্তার ট্রামগাড়ী বন্ধ হইয়া গিয়াছিল।

বামারচনা।

"কি যেন গো নাই।"

কি যেন গো নাই, এ পরাণ তাই
হয়েছে অধীর প্রায়।
কে যেন গো ছিল, কোথা চলে গেল
করি সব শূন্যময়।
যেন কোন সুরে নিকটে কি দূরে
বাজিল মোহন বাঁশী।
নয়ন মেলিতে যেন সে চকিতে
কোথায় গিয়াছে মিশি।
ছায়ার মতন আসিয়া কখন
গিয়াছে না বলে চলি।
তপ্ত লোহা দিয়া যেন মোর হিয়া
কে আজি দিয়াছে জ্বেলে।
কে যেন অজানা দিতেছে বেদনা
প্রাণের মাঝেতে থাকি।
দুদিনের তরে এ হৃদি-মাঝারে
উঠেছিল পিক ডাকি।
নিশাটি পোহাতে অরুণ উদিতে
আমার তরুণ পাখী—
আধ ফোটা ফুল সুবাস অতুল
দিয়ে গেছে মোরে ফাঁকি।
সে যে হেথা নাই মোর প্রাণ তাই
কাঁদেগো বেদনা-ভরে
ব্যাকুল হৃদয় আজ কোথা ধায়
ধরিতে হৃদয়ে তারে।

শ্রীমতী সন্তোষ-কুমারী দেবী।

প্রার্থনা।

প্রাণপ্রিয় চিদানন্দ হে চিত্ত-বিহারী!
কমল শ্রীপদতল দ্রবিয়া তোমারি—
এসেছে ভারতে এবে যে পূত প্রবাহ।
স্বদেশী ভাবের মহা পূরিত উৎসাহ।
যেন সে ভাবের নব প্রবাহ আবার,
সগর-বংশের ন্যায় করে হে উদ্ধার;
মোহেতে পতিত যত ভারত-সন্তানে,
প্রক্ষালিয়া মোহ-মসী নব শক্তি দানে।
প্রণমি চরণে নাথ! করি এ প্রার্থনা,
দয়া করে পূর্ণ কর দাসীর কামনা।

শ্রীমতী সুশীলা সুন্দরী মিত্র,
শোভাবাজার রাজবাটী।

স্বর্গীয় উমেশচন্দ্র দত্ত।

আমরা গভীর-শোক-সন্তপ্ত হৃদয়ে বামা-বোধিনীর পাঠকপাঠিকাদিগকে অবগত করিতেছি যে, যিনি প্রায় চুয়াল্লিশ বৎসর তাঁহাদের সেবা করিয়াছিলেন, বিগত ৪ঠা আষাঢ় (১৯ শে জুন) রাত্রি ১০ ঘটিকার পর তিনি ইহলোক পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন। তিনি তাঁহাদের সেবা করিতে নিজের ক্লেশ, রোগ, পারিবারিক বিপদ ও শোক অগ্রাহ্য করিয়া প্রফুল্ল-চিত্তে তাঁহার প্রিয় বামাবোধিনীর কল্যাণ অন্বেষণ করিতেন। অদ্য আমরা তাঁহার অভাবে চতুর্দ্দিক শূন্য দেখিতেছি। সে অভাব কেহ পূর্ণ করিবার উপযুক্ত লোক নাই। বামাবোধিনী তাঁহার মানস-কন্যা ছিলেন, এখন তিনি পিতৃহীনা হইলেন।

পাঠকপাঠিকারা আছেন, লেখক-লেখিকারা আছেন,কিন্তু সেরূপ যত্ন করিবে কে? সেই অধ্যবসায়, সেই অকৃত্রিম অনু-রাগ কোথায়? স্ত্রীজাতির উন্নতি তাঁহার জীবনের প্রধান কার্য্য ছিল। যখন এদেশে একখানিও স্ত্রীপাঠ্য পত্রিকা ছিল না, তখন তাঁহার বিশেষ চেষ্টায় ১২৭০ বঙ্গাব্দের ভাদ্র মাস হইতে এই পত্রিকা প্রকাশিত হইয়া আসিতেছে। তাঁহার এই মহতী কীর্ত্তি ভগবান্ আপনি রক্ষা করিবেন, কিন্তু এক জনের অভাব কিছুতেই পূর্ণ হইবে না।

স্ত্রী-জাতির উন্নতির জন্য প্রথমে তিনি অন্তঃপুর-স্ত্রীশিক্ষা-প্রণালী বঙ্গদেশে প্রচলিত করেন। পাঠ্য পুস্তক নির্দ্ধারিত হইত। যে সকল অন্তঃপুরবাসিনীরা বিদ্যালয়ে পাঠ করিতে পারিতেন না, তাঁহাদের শিক্ষার জন্য এই ব্যবস্থা হইয়াছিল। বৎসরান্তে তাঁহাদিগের পরীক্ষা গ্রহণ করা হইত এবং যোগ্যতা অনুসারে পুরস্কার প্রদত্ত হইত। আমাদের অনেকের গৃহিণীরা ঐ পরীক্ষা দিতেন এবং পুরস্কার লাভ করিতেন।

যেমন স্ত্রীশিক্ষা তাঁহার জীবনের একটী কার্য্য ছিল, সেইরূপ বালক-দিগের শিক্ষার জন্যও তিনি স্বর্গীয় আনন্দ মোহন বসুর সহিত সিটি কলেজ স্থাপন করেন। সেই সময়ে ঐ শ্রেণীর বিদ্যালয় কলিকাতায় অতি অল্পই ছিল। জীবনের শেষ অবস্থা পর্য্যন্ত তিনি ঐ বিদ্যালয়ে প্রধান কর্ম্মচারী (Principal) ছিলেন। কিরূপে নিঃস্বার্থভাবে কার্য্য করিতে হয়, সিটি কলেজে তাহা তিনি দেখাইয়া গিয়াছেন। শিক্ষাবিভাগে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেট সভার সদস্য ছিলেন। বিদ্যাদানই তাঁহার জীবনের প্রধান ব্রত ছিল। প্রথম বয়সে তিনি হিন্দু স্কুল ও স্বদেশস্থ হরিনাভি, নিবাধই স্কুল প্রভৃতিতে শিক্ষকের কার্য্য করিতেন।

ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যে উমেশচন্দ্র প্রথম বয়স হইতেই উৎসাহী ছিলেন। তাঁহার অধ্যবসায়, উৎসাহ, নির্ভীকতা এবং বিবেকপরায়ণতার ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত

তাঁহার জীবনে পরিলক্ষিত হয়। আমরা ক্রমে সেই সকল প্রকাশ করিব। যখন ধর্ম্মমত লইয়া দেশের জমিদারদিগের সহিত তাঁহার বিরোধ উপস্থিত হয়, তখন তাঁহারা তাঁহাদের উপাসনালয়ে প্রবেশ করিয়া দীপ নির্ব্বাণ, তাঁহাদিগকে প্রহার, সমাজগৃহে কালীমূর্ত্তি স্থাপন প্রভৃতি কার্য্য দ্বারা তাঁহাদিগকে উৎপীড়িত করেন। উমেশচন্দ্র অটল পর্ব্বতের ন্যায় সে সকল সহ্য করিয়াছিলেন। কলিকাতায় আসিয়া তিনি প্রথম হইতেই আদি ব্রাহ্মসমাজের সভ্য হইয়াছিলেন, এবং শুনা যায় ঐ সমাজে দীক্ষিতও হইয়াছিলেন। তখন অন্য সমাজ ছিল না। পরে তিনি কেশবচন্দ্রের সহিত ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজে যোগদান করেন। তিনি ঐ সমাজের একজন অধ্যবসায়ী সভ্য এবং তৎকালীন সঙ্গত সভার সম্পাদক ছিলেন। কুচবিহার বিবাহের পর তিনি সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশ করেন এবং শেষ জীবন ঐ সমাজস্থাপনাবধি তাহারই সেবায় অতিবাহিত করিয়াছেন। তাঁহার ন্যায় সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের হিতৈষী ব্যক্তি দৃষ্ট হয় না এবং তাঁহার অভাব পূরণ করিবার লোক নাই। সকল বিভাগেই তিনি হৃদয়ের গভীর উৎসাহে কার্য্য করিতেন। তিনি আচার্য্য, কার্য্যনির্ব্বাহক ও অধ্যক্ষ সভার সভ্য এবং সাধনাশ্রমের সেবক ছিলেন। তাঁহার যত্নে সঙ্গত সভা প্রতিষ্ঠিত ও সুরক্ষিত হইয়াছিল।

মূক-বধির বিদ্যালয়ের তিনি জন্মদাতা। প্রথমে সামান্য সূত্রে ঐ বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। অবশেষে রাজকীয় কর্ম্মচারীদিগের সহায়তায় এখন তাহার অবস্থা সুন্দর এবং তাহার গৃহও নির্ম্মিত হইয়াছে।

কলিকাতা ও স্বীয় জন্মভূমির অনেক হিতকর কার্য্যে তিনি ব্যাপৃত ছিলেন। দুঃখী দরিদ্রদিগের জন্য অনাথবন্ধু ভাণ্ডার প্রভৃতির ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।

এইবহুগুণসম্পন্ন পুণ্যাত্মা বৃহৎ পরিবার রাখিয়া ৬৭ বৎসর বয়সে তাঁহার পুণ্যের পুরস্কারলাভার্থে অমরধামে যাত্রা করিয়াছেন। সেখানে তাঁহার সহধর্ম্মিণী ও স্নেহভাজন কন্যাকে দেখিয়া তাঁহার শোকসন্তপ্ত হৃদয় শীতল হইবে। দয়াময় ঈশ্বর তাঁহাকে তদীয় শীতলাশ্রয় প্রদান করুন।

স্বর্গীয় উমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের ৪র্থী শ্রাদ্ধক্রিয়া উপলক্ষে পঠিত।

আজ আমাদের পরমপূজনীয় স্নেহময় পিতৃদেব চারি দিন হইল ইহলোক ত্যাগ করিয়া পিতার পিতা পরম পিতার নিকট চলিয়া গিয়াছেন। আজ আমরা মাতৃ-

পিতৃহীনা অনাথা; এ সংসার এখন আমাদের নিকট ঘোর অন্ধকারে আচ্ছন্ন। এখন আমরা কোন্ পথে যাইব, কিরূপ ভাবে জীবন-পথে চলিব, কিছুই ভাবিয়া ঠিক্ করিতে পারিতেছি না। আমরা স্বপ্নেও জানিতাম না যে এত শীঘ্র আমাদের ভাগ্যাকাশ এরূপ ঘোর অন্ধকার-মেঘে আবৃত হইবে। পিতার স্নেহ-ক্রোড়ে নির্ভাবনায় নিশ্চিন্তমনে দিন কাটাইতেছিলাম। তিনি কত দিন আমাদিগকে প্রস্তুত হইবার জন্য বলিয়াছেন "আমার শেষ হইয়া আসিল, আমি চলিলাম। আমার ডাক পড়িয়াছে।" এরূপ কথা প্রায়ই তাঁহার মুখ হইতে শুনিতাম, কিন্তু আমরা কিছুতেই প্রস্তুত হইতে পারি নাই। আজও বিশ্বাস করিতে পারিতেছি না যে, পিতা আমাদের ছাড়িয়া চিরদিনের মত চলিয়া গিয়াছেন। মনে হইতেছে যেন তিনি কোথাও বেড়াইতে গিয়াছেন, আবার আসিবেন। তাঁহার সেই স্নেহমাখা মধুর ডাক আবার শুনিব, আবার তাঁহার সঙ্গে মিলিত হইয়া পরম পিতা পরমেশ্বরের উপাসনা করিব, তাঁহার মুখের মধুর সঙ্গীত শ্রবণ করিয়া দগ্ধ প্রাণ শীতল করিব। অহো! আর এ জীবনে তাঁহার দেখা পাইব না, ভাবিতে গেলে হৃদয় যে বিদীর্ণ হইয়া যাইতেছে। প্রেমময়! দয়াময়! চিরদিন তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হইবে। আমরা যেন পিতার আদর্শ জীবন ধারণ করিয়া, তাঁহার পদানুসরণ করিয়া, তাঁহার মনের মত হইয়া, প্রেমময়! তোমার প্রদত্ত এই জীবন-পথে চলিতে পারি। তুমি আজিকার এই পবিত্র দিনে আমাদের আশীর্ব্বাদ কর। এখন তোমার আশীর্ব্বাদ ও আমাদের পরমপূজনীয় পিতা, মাতা ও পিতৃপুরুষদের আশীর্ব্বাদই এ ভগ্ন হৃদয়ের ও অন্ধকারময় জীবনের এক মাত্র ভরসা। আজিকার এই দিনে পিতার বিশেষ বিশেষ গুণের কথা আলোচনা করিয়া, তাঁহার পদানুসরণ করিয়া আমাদের জীবনকে যেন ধন্য করিতে পারি। তিনি জীবিতাবস্থায় তাঁহার প্রশংসা শুনিলে দুঃখিত হইতেন, তাঁহার লজ্জা বোধ হইত। কিন্তু আজ আর তিনি এ পৃথিবীতে নাই, সুতরাং তাঁহার প্রশংসা শুনিয়া দুঃখিত বা লজ্জিত হইবেন না। আজ এই মনে করিয়া আমরা তাঁহার জীবনের বিশেষ বিশেষ গুণের কথা মুক্তকণ্ঠে বলিয়া আপনাদের জীবনকে ধন্য করিব।

পিতা ১০ বৎসর বয়সের সময় পিতৃহীন হন। অভিভাবক আর কেহ ছিল না। তাঁহার বিধবা মাতা ও ঠাকুরমাতাই তাঁহাদের সর্ব্বস্ব। তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা তাঁহার অপেক্ষা ২॥০ বৎসরের বড় ছিলেন। পিতার তিন সহোদর ও দুই ভগ্নী। ভগ্নীগুলি অতি অল্প বয়সেই পরলোক গমন করেন। বাবা প্রথমে দেশের পাঠশালায় পড়িতেন। তাঁহার নিকট শুনিয়াছি, সকালবেলা ঘুম হইতে উঠিলে ঠাকুর মা গায়ের দোলায়ে মুড়ি বাঁধিয়া দিয়া তাঁহাকে পাঠশালায় পাঠাইতেন, সেই মুড়িগুলিই প্রাতঃকালের

জলযোগ। ঠাকুর দাদা তাঁহাদের জন্য বিশেষ কিছুই সংস্থান করিয়া যাইতে পারেন নাই। তিনি সামান্য নায়েবীর কার্য্য করিতেন, বাড়ীতে অনেকগুলি পোষ্য ছিল, যাহা পাইতেন তাহাদিগকে খাওয়াতেই তাহা প্রায় নিঃশেষ হইয়া যাইত। এই অল্প আয়ের মধ্যেও তিনি তিনটী পুত্রের জন্য তিন খানি চক লইয়া যাহাতে তাহাদের খাওয়া ও পরা চলে এরূপ বন্দোবস্ত করিয়া যান। সেই আয়ের উপর নির্ভর করিয়া আমার ঠাকুর মা তিনটী পুত্রকে প্রতিপালন করেন। বাবার নিকট শুনিয়াছি, ঠাকুর মার অতিথিসেবার প্রতি এরূপ ভক্তি ছিল যে, অনেক দিন এরূপ ঘটিয়াছে, ঠাকুর মা খাইতে বসিবেন এমন সময় এক জন আসিয়া পড়িল, তিনি তৎক্ষণাৎ সেই নিজের মুখের ভাত অতিথিকে দিয়া উঠিয়া পড়িলেন, ঘরে এমন আর কিছু নাই যে সেদিন খান, একটু গুড় মুখে দিয়া দিন কাটাইয়া দিলেন। এরূপ প্রায়ই ঘটিত; কারণ আমাদের পৈতৃক বাসস্থান গঙ্গার নিকটে ছিল, অনেক দূর দেশ হইতে লোকে গঙ্গাযাত্রা করিয়া আসিয়া থাকিত। তাহাদের আহার করান, রোগীর তত্ত্বাবধান করা ঠাকুরমার একটী প্রধান কার্য্য ছিল। পিতা তাঁহার মাতার নিকট হইতে এই সকল গুণের অধিকারী হইয়াছিলেন।

পিতা দেশের বঙ্গ বিদ্যালয় হইতে পরীক্ষা দিয়া প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হন এবং পরে এণ্ট্রান্স পাশ করিয়া বৃত্তি পান। সেই বৃত্তির টাকা লইয়া তিনি এফ,এ পড়িবার জন্য কলিকাতায় আসেন। তাঁহার নিকট শুনিয়াছি, তিনি নিজে রন্ধন করিয়া খাইয়া ও ২।৪ জন আত্মীয়কে খাওয়াইয়া স্কুলে যাইতেন। তাঁহার উপর প্রাইভেট টুইসনিও ছিল। সমস্ত দিন পরিশ্রম করিয়া সন্ধ্যার সময় বাড়ী ফিরিতেন, আসিয়া রন্ধন করিয়া সকলকে খাওয়াইয়া পড়িতে বসিতেন। শুনিয়াছি, সেই বাড়ীর উপর তলায় যত সব অসৎ লোক থাকিত, তাহারা রাত্রে এরূপ উৎপাত করিত যে, সেখানে এক মুহূর্ত্ত থাকা যেন অসম্ভব মনে হইত। সেই বাড়ীর একতলার একটী ঘরে বাবা পড়িতে বসিতেন, সেই সময়ই উহারা উৎপাত আরম্ভ করিত। বাবা ভাবিতেন এরূপ করিয়া তিনি কখনও পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারিবেন না। যখন তিনি দেশে যাইতেন, তখন তাঁহার উপর বাড়ীর কার্য্য এত পড়িত যে, এক পাতা পড়িতেও তিনি সময় পাইতেন না। এদিকে এরূপ, ওদিকে সংসারের সকল খরচ বাবাকে দিতে হইত। আত্মীয় স্বজন যখন শুনিলেন, বাবা বৃত্তি পাইতেছেন, চাকরি করিতেছেন, একে একে সকলে আসিয়া আশ্রয় লইতে লাগিল। এইরূপে বহু দূর সম্পর্কের কত লোক আসিয়া জুটিল। ঠাকুর মা কাহাকেও কিছু বলিতে পারিতেন না। তাহারা থাকিয়াই গেল।

এফ এ, পাশ করিয়া বাবা ডাক্তারি পড়িতে আরম্ভ করেন। কিছু দিন পড়িয়া ডাক্তারি ছাড়িয়া দেন। সেই সময় হইতেই তিনি ব্রাহ্ম সমাজে যোগ দিতে আরম্ভ করেন। শুনিয়াছি, অক্ষয় বাবুর লেখাই তাঁহাকে ব্রাহ্ম সমাজের দিকে আকর্ষণ করে। ২৫ বৎসর বয়সের সময় পিতার বিবাহ হয়। তখন প্রথম ব্রাহ্মানুষ্ঠানের সূত্রপাত হইতেছে। বাবা স্থির করিলেন যে, ব্রাহ্ম মতে বিবাহ হইবে। তখন এরূপ কোন নিয়ম পদ্ধতি হয় নাই, ব্রহ্মোপাসনাই সর্ব্বপ্রধান ছিল। মার বয়স তখন নয় বৎসর মাত্র। হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য্য ও ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন এই বিবাহ দেন।

বি, এ পাশের পর হিন্দু স্কুলে বাবার প্রথম কাজ হয়। পরে নিবাধই ও অন্যান্য স্থানে কার্য্য করেন। এ সকলের মধ্যে হরিনাভিই বিশেষ উল্লেখযোগ্য। হরিনাভি ইংরাজি বিদ্যালয় ও ব্রাহ্ম-সমাজ তাঁহারই যত্নে ও চেষ্টায় আজ উঠিয়া দাঁড়াইয়াছে। সিটি স্কুল ও মূক-বধির-বিদ্যালয়ও তাঁহার যত্ন ও পরিশ্রমের সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। ব্রাহ্ম সমাজের কার্য্যও তিনি অনেক করিয়াছেন। এস্থানে সকল বিষয়ের বিস্তারিত বর্ণনা করিতে গেলে দিন শেষ হইয়া যাইবে। সেই জন্য সংক্ষেপে তাঁহার বিষয় কিছু বলিব।

পিতার মনের বল অসাধারণ ছিল। প্রথম যখন তিনি ব্রাহ্ম হন, দেশের লোক সকলে তাঁহার বিরোধী হইয়া উঠে, এমন কি দেশের জমিদারেরা পর্য্যন্ত তাঁহাকে শাস্তি দিবার (জব্দ করিবার) জন্য বিশেষ চেষ্টা করেন। শুনিয়াছি, বাবার ঠাকুর মা যখন মারা যান, তখন জমিদারেরা ও অন্যান্য সকলে দোকানদারদের নিষেধ করিয়া দেন যে, কেহ যেন তাঁহাদের কাঠ বিক্রয় না করে ও তাঁহাদের বাড়ী না যায়। বাবা বলিয়াছিলেন যে, তিনি সমস্ত দোকান ঘুরিয়াছিলেন, কেহ কাঠ দিল না; রাত্রি হইয়া গেল, একটা লোক, কি কাঠ কিছুই পাইলেন না। তখন তাঁহার জেঠা মহাশয় অত্যন্ত রাগিয়া উঠিয়া বলিলেন, "কি দেশের লোক আমাদের জব্দ করিবে? আচ্ছা দেখি কিরূপে তাহারা আমাদের উদ্দেশ্য নষ্ট করে।" এই বলিয়া তিনি একখানি কুঠার লইয়া, বাবাকে সঙ্গে করিয়া, আপনাদের বাড়ীর বাগানের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। সেখান হইতে একটা বড় গাছ কাটিয়া আনিয়া ঠাকুরমাকে দাহ করিলেন। তখন সমস্ত দেশের লোক আশ্চর্য্য হইয়া গেল। তাহার পর শ্রাদ্ধের সময়ও অনেকে বাধা দেয় ও গোলযোগ উপস্থিত করে। বাবা শেষে কলিকাতা হইতে উপাসক ও বন্ধুদিগকে লইয়া গিয়া শ্রাদ্ধ ক্রিয়া সম্পন্ন করেন। তাহার পর হরিনাভি ব্রাহ্ম-সমাজ স্থাপন করিবার সময় কত কষ্ট যে ভোগ করিয়াছেন, বলা যায় না। তাঁহার সহিষ্ণুতা ও ধৈর্য্য অতি আশ্চর্য্য ছিল। প্রথমে একটা

ঘরে ব্রহ্মোপাসনার স্থান ঠিক করেন। সেখানে তাঁহার ২।১ টী বন্ধু ও ছাত্রেরা আসিয়া উপাসনায়যোগ দিতেন, ইহা দেখিয়া দেশেরলোকের বড় ভয় হয় তাহারা এরূপ কার্য্য দেশে যাহাতে না হয়, তাহার চেষ্টা করে এবং বাবাকেও এরূপ কার্য্য করিতে নিষেধ করে। তাহাতেও যখন উহা বন্ধ না হইল, তখন তাহারা ভয় দেখাইতে লাগিল। পিতা পুনরায় কলিকাতায় আসেন এবং এখানকার ২।১ জন বন্ধুকে সঙ্গে লইয়া প্রত্যেক সপ্তাহে উপাসনা করিতে যাইতেন। দেশের লোকেরা দেখিল, দেশ হইতে উঁহাকে তাড়াইয়াও কার্য্য বন্ধ করিতে পারিল না। পরিশেষে একদিন উপাসনা হইতেছে এমন সময় কতকগুলি লোক ভয়ানক গোল মাল করিয়া উপাসনা ভঙ্গ করিয়া দেয় এবং যে সকল ছাত্র আসিয়া যোগ দিয়াছিল তাহাদিগকে মার পিট করে। পর সপ্তাহে বাবা গিয়া দেখেন উপাসনাগৃহের মধ্যে এক কালীমূর্ত্তি স্থাপিত হইয়াছে এবং তাঁহার সেবার জন্য লোক নিযুক্ত হইয়াছে। সেখানে যে ব্রহ্মোপাসনা হইত তাহার চিহ্নমাত্র নাই। বাবা ও তাঁহার বন্ধুগণ গিয়া উপাসনা-গৃহের দাবী করাতে, তাহারা অম্লান বদনে বলিল এখানে কোন কালে ব্রাহ্মসমাজ ছিল না, এটা আমাদের চির কালের কালীমন্দির, তোমরা চলিয়া যাও। পরে প্রতিবেশী লোকদিগকে ডাকিয়াও ব্যাপারটী বলা হইল, তাহারাও বলিল আমরা জন্মিয়া অবধি উহা কালীর মন্দির জানি, ওখানে ব্রাহ্মসমাজ কোন কালে ছিল না। পিতা নিরুপায় হইয়া চলিয়া আসিয়া ভাবিতেছেন কি করিবেন, এমন সময় একজন লোক আসিয়া বলিল যে, আপনাকে বাবু ডাকিয়াছেন এবং বলিয়াছেন যে, যত দিন না অন্য কোন স্থলে উপাসনার স্থান ঠিক হয়, তত দিন তাঁহার বাড়ীতে উপাসনা করিবেন ও এইখানেই আহার করিবেন। বাবা ইহা ভগবানের বিশেষ দয়া মনে করিয়া, সানন্দচিত্তে তাঁহাকে ধন্যবাদ দিয়া, তথায় চলিলেন। তথায় সেই বন্ধু অতি যত্নের সহিত তাঁহাদিগকে অভ্যর্থনা করিয়া-উপাসনার স্থান করিয়া দিলেন এবং উপাসনান্তে তৃপ্তিপূর্ব্বক আহার করাইলেন। যত দিন অন্য স্থান না পাইলেন, তত দিন সেই স্থানেই উপাসনা চলিল। আশ্চর্য্য এই যে, যাঁহারা প্রথমে তাঁহাদের বিরুদ্ধে থাকিয়া সমাজ উঠাইয়া দেন, শেষে তাঁহারাই আবার ব্রাহ্ম সমাজ নির্ম্মাণের ভূমি দান করেন ও উহা প্রস্তুত করিবার সময় সাহায্য করেন।

পিতা যাহা করিবেন বলিতেন, তাহা না করিয়া ছাড়িতেন না। ১২ বৎসর বয়সের সময় তিনি মৎস্য ত্যাগ করেন। একবার তাঁহার ভয়ানক অসুখ হয়, কবিরাজ সিঙ্গিমাছের ঝোল ও ভাত খাইতে বলেন। তাহাতে তিনি কিছুতেই সম্মত হন না। ইহা দেখিয়া ঠাকুর মা লুকাইয়া মাছের ঝোল রাঁধিয়া তাহা ছাঁকিয়া খাওয়াইতে যান। বাবা ভাত

মাখিবা মাত্র বুঝিতে পারিয়া বলিলেন, তুমি মাছের ঝোল আমাকে দিয়াছ, আমি ভাত খাইব না। ঠাকুর মা শেষে মিথ্যা কথা কহিলেন; বলিলেন, না মাছের ঝোল নয়, মাছের ঝোল কি এইরূপ হয়। বাবা কিছুতেই তাহা খাইলেন না। তখন পুনরায় নিরামিষ ঝোল করিয়া তাঁহাকে খাওয়ান হয়।

তিনি যে সকল মহৎ কার্য্য করিতেন, তাহা কাহাকেও জানাইতেন না। নিজে খ্যাতি লাভ করিবার জন্য তিনি কখন চেষ্টা করেন নাই। তিনি প্রায়ই বলিতেন "তৃণাদপি সুনীচেন তরোরপি সহিষ্ণুনা। অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ॥" পিতা নিজের জীবনে ইহা সুন্দররূপে দেখাইয়া গিয়াছেন। তিনি কত শত ঝঞ্ঝাবাত সহ্য করিয়াছেন, কিন্তু তাহা কাহাকেও কখন জানান নাই। তিনি নিজে কখন মান লইবার জন্য ব্যস্ত হন নাই, কিন্তু অন্যকে সম্মান দিবার জন্য অস্থির হইতেন। সংসারে শোক তাপ দুঃখ দারিদ্র্যের মধ্যে থাকিয়াও তিনি কখন দুঃখ প্রকাশ কিম্বা কর্ত্তব্য কার্য্যে অবহেলা করেন নাই। যত দিন শরীরে এক বিন্দু শক্তি ছিল, তত দিন তিনি জগতের হিতের জন্য খাটিয়াছেন। শেষ মুহূর্ত্ত অবধি বামাবোধিনীর কার্য্যের জন্য চিন্তা করিয়া গিয়াছেন। আশ্চর্য্য তাঁহার ধৈর্য্য! তিনি অসহ্য রোগের যাতনা কখন প্রকাশ করেন নাই, নীরবে সহিয়া চলিয়া গিয়াছেন। মৃত্যুর একমাস পূর্ব্ব হইতে তাঁহার শরীর ভাঙ্গিতে আরম্ভ হয়। তিনি রাত্রে ঘুমাইতে পারিতেন না, ইহা কাহাকেও বলেন নাই। একদিন রাত্রে আমার ঘুম হয় নাই আমি এদিক ওদিক করিয়া বেড়াইয়াছিলাম। প্রাতঃকালে যখন উপাসনায় আসি, তখন জিজ্ঞাসা করেন, রাত্রে কি তোর ঘুম হয় নাই? আমি আশ্চর্য্য হইলাম, জিজ্ঞাসা করিলাম কেন? তখন বলিলেন, তোর কথা শুনিতে পাই, তুই এঘর ওঘর করিস, শব্দ পাই। আমি শুনিয়া ত অবাক্। বলিলাম কেন তোমারও কি রাত্রে ঘুম হয় না? তখন বলিলেন হাঁ আজ দিন কতক হইল রাত্রে ঘুম হয় না, আর বড় গা জ্বালা করে। ইহা শুনিয়া আমরা সকলে বড় চিন্তিত হইলাম এবং তাঁহাকে একটু বিশ্রাম লইবার জন্য অনুরোধ করিতে লাগিলাম। তখন,তিনি বলিলেন "আমার জীবন শেষ হইয়া আসিয়াছে, যে কটা কাজ করিতে পারি করি।" ক্রমে ক্রমে মাথাঘোরা আরম্ভ হইল। ডাক্তার দেখাইবার জন্য বলা হইল, কিছুতে দেখাইবেন না, অনেক কষ্টে রাজি করিয়া দেখান হইল। কিন্তু ঔষধ খাইতে ইচ্ছা নাই, জোর করিয়া আমরা ঔষধ খাওয়াইতাম। এই অবস্থায় তিনি এক দিন সত্য সুন্দর দেবের ফ্যাক্টারিতে উপাসনা করিয়া, না খাইয়া,সেখান হইতে হরিনাভি চলিয়া যান। সকলে নিবারণ করিলাম, কিছুতেই শুনিলেন না। বলিলেন "শরীর খারাপ, খাওয়া হয় নাই বলিলে কি হইবে, আজ

কয় সপ্তাহ ধরিয়া আমি সমাজে উপাসনায় যাইতে পারিতেছি না, আজ যাইবই।"

দার্জ্জিলিং যাইবার দিনকতক পূর্ব্বে মাথা ঘোরা ভয়ানক বাড়ে, উপর হইতে নীচে নামিতে কিম্বা দুই এক পা চলিতে গেলেও ঘুরিয়া পড়িতেন; কিন্তু তথাপি তাঁহার কর্ত্তব্য কার্য্যে ত্রুটি ছিল না। মহলানবিশ মহাশয় মটর গাড়ি চাপা পড়িয়াছেন শুনিয়াই তাহাকে দেখিবার নিমিত্ত ঐরূপ অবস্থাতেই হাঁটিয়া গেলেন, গাড়ি আনিতে দিলেন না। তাহার পরও আবার বিবাহের রেজিষ্টারি করেন।

দার্জ্জিলিং গিয়া, তিনি দশ দিন মাত্র তথায় ছিলেন। যখন তিনি বাটীতে ফিরিয়া আসিলেন, তখন তাঁহার অবস্থা দেখিয়া আমরা সকলে কাঁদিতে লাগিলাম। সে সময় তাঁহার কথা কহিতেও কষ্ট হইতেছিল, তথাপি তিনি পাড়ার ও বাড়ীর সকলের সংবাদ জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন।

সোমবার দিন ১১ টার সময় দার্জ্জিলিং হইতে বাড়ীতে ফিরিয়া আসেন। বুধবার রাত্রি ১১ টার সময় তাঁহার নশ্বর দেহ পৃথিবীতে ফেলিয়া অনন্ত ধামে চলিয়া যান। এ কয় দিন মুখে অন্য কোন কষ্ট প্রকাশ করেন নাই। কেবল খাইতে কষ্ট হইত, বলিতেন। বড় মামা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, আপনার কি খাইতে ইচ্ছা করে? তাহাতে বলিয়াছিলেন সেরূপ কিছুই নয়, পাতলা জিনিস যাহা কিছু পার, গলায় ঢালিয়া দিলেই খাইব। শেষ মুহূর্ত্ত অবধি তাঁহার সম্পূর্ণ জ্ঞান ছিল। যখনই ডাকিয়াছি, তখনই চাহিয়া দেখিয়াছেন। সোমবার বড় দুর্ব্বল হইয়া পড়েন, মঙ্গলবার একটু ভাল ছিলেন, বুধবার সকাল হইতেই অবসন্ন হইয়া পড়েন এবং ধীরে ধীরে নীরবে এ পৃথিবী ত্যাগ করিলেন। অনেক মৃত্যু দেখিয়াছি, কিন্তু এরূপ কখন দেখি নাই। তাঁহার শেষ মুহূর্ত্তে ঠিক যেন মনে হইতে লাগিল, তিনি মহাযোগে নিমগ্ন হইয়া রহিয়াছেন; তাঁহার শরীরের এই অসহ্য যন্ত্রণা যেন কিছুই বুঝিতে পারিতেছেন না। একটু একটু করিয়া মহাযোগী মহাযোগ-ধ্যানে নিমগ্ন হইলেন।

অহো! বাবা আজ কোথায়! আজ আমাদের গৃহ শূন্য! আজ আমাদের হৃদয় শূন্য! আর আমাদিগকে কে উপদেশ দিয়া ধর্ম্মপথে অগ্রসর করিবে! দয়াময়! এ সংসার যে মরুভূমর মত বোধ হইতেছে। দয়াময় প্রেমময় পরম পিতা! আজ আমাদের হৃদয়ের অবস্থা, মনের অবস্থা সকলই তুমি জানিতেছ। এই পরীক্ষাপূর্ণ সংসারে তুমি আমাদের সহায় হইয়া হস্ত ধারণ পূর্ব্বক লইয়া চল। দয়াময়! আশীর্ব্বাদ কর, আমরা যেন পিতার উপযুক্ত পুত্র কন্যা হইয়া, তাঁহার শুভ ইচ্ছা পূর্ণ করিয়া, আপনাদের জীবন কৃতার্থ করিতে পারি।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

No. 528. August, 1907.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

স্বর্গীয় উমেশচন্দ্র দত্ত বি, এ, কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত।

৪৫ বর্ষ। ৫২৮ সংখ্যা। { শ্রাবণ, ১৩১৪। আগষ্ট, ১৯০৭। } ৮ম কল্প। ৪র্থ ভাগ।

ধর্ম্মবীর

৺উমেশচন্দ্র দত্ত।

জন্ম—১২৪৭ সাল, ৩রা পৌষ, কৃষ্ণা নবমী। স্বর্গারোহণ—১৩১৪ সাল, ৪ঠা আষাঢ়, বুধবার, রাত্রি ১০৷৷০টা।

এই দুর্দ্দিনে আজি দেশের সর্ব্বনাশ করিয়া, আমাদের প্রাণে বজ্র হানিয়া, পুণ্য জীবনের অপূর্ব্ব আদর্শ, পুণ্যশ্লোক উমেশচন্দ্র দত্ত অমরধামে প্রস্থান করিলেন। মহাত্মা ৺আনন্দমোহনের ও ৺কালীচরণের বিয়োগাশ্রু না থামিতেই একি সর্ব্বনাশ! আজি পূর্ব্ব দুইটীর শোক নবীভূত হইল, এবং তিনের শোকাশ্রু বাঙ্গালার প্রত্যেক নরনারীর নয়ন ও বক্ষ প্লাবিত করিয়া ত্রিবেণীর ন্যায় ত্রিধারায় প্রবাহিত হইল। পুণ্যশ্লোক উমেশচন্দ্র একাধারে গৃহী ও যোগী ছিলেন। অগ্নিময় সংসারমধ্যে থাকিয়া, আদ্যোপান্ত এমন প্রশান্ত, এমন নির্ম্মল, নিষ্কাম, পুণ্যময় জীবন গৃহিমাত্রেরি শিক্ষার স্থল।

যথায় সৎসঙ্কল্প, সদনুষ্ঠান, সৎপ্রসঙ্গ, তথায় উমেশমূর্ত্তি বিদ্যমান। যেন একই সূর্য্যের প্রতিবিম্ব অসংখ্য তরঙ্গে সমভাবে দীপ্যমান।

"অদ্রোহঃ সর্ব্বভূতেষু কর্ম্মণা মনসা গিরা।
অনুগ্রহশ্চ দানংচ সতাং ধর্ম্মঃ সনাতনঃ॥"

কায়মনোবাক্যে পরপীড়াবর্জ্জন, সকলেরি প্রতি অভিন্ন প্রীতি ও প্রিয়হিতচিকীর্ষা, যথাশক্তি দান,—ইহাই সাধুর সনাতন ধর্ম্ম। আর্য্যের এই শাশ্বত ব্রতে উমেশচন্দ্র আবাল্য দীক্ষিত। তিনি দশ বর্ষ বয়সে পিতৃ-বিয়োগের পর হইতে আমিষত্যাগী এবং কায়মনোবাক্যে সংযমী। তিনি কর্ত্তব্যপালন-মহাব্রত যাবজ্জীবন অটল-ভাবে পালন করিয়াছেন। মৃত্যুর কয়েক দিন পূর্ব্বে যখন তাঁহার দেহ অতিমাত্র অবসন্ন, তিনি প্রত্যূষে উঠিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে স্খলিতপদে গৃহে গৃহে গিয়া

লোকসংগ্রহ করিয়া স্বর্গীয় মহাত্মা ডেভিড্ হেয়ার সাহেবের বার্ষিক স্মৃতিকৃত্য, তাঁহার সমাধিস্থানে গিয়া সম্পন্ন করিয়াছিলেন।

কামক্রোধাদি রিপু তাঁহার নিকট অপরিচিত ছিল। ধৈর্য্যচ্যুতির অসংখ্য কারণে পরিবেষ্টিত হইয়াও, প্রফুল্লহৃদয়ে অসংখ্য দৈনিক কার্য্য ধীরে ধীরে সম্পন্ন করা তাঁহার অভ্যাস ছিল। কোনও অবস্থায়, কোনও কারণেই তিনি ধৈর্য্যচ্যুত বা কর্ত্তব্যভ্রষ্ট হন নাই। কর্ত্তব্যে এরূপ অশ্রান্ত অক্লান্ত পরিশ্রমী, উদ্যোগী ও অভিনিবিষ্ট, শান্ত, দান্ত, স্বভাবধার্ম্মিক সাধুপুরুষ অল্পই দেখিয়াছি। ঘটনাক্রমে এক দিন তিনি আমার গৃহে রাত্রিযাপন করেন। তাঁহার নৈশ কার্য্য গোপনে দেখিয়াছি। রাত্রি প্রায় ১১টা পর্য্যন্ত আমার সঙ্গে তাঁহার ভগবৎপ্রসঙ্গ হইল। পরে যৎসামান্য একটু জলযোগ করিয়াই শয়নের ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। আমি তাঁহাকে শয়ন করিতে বলিয়া, অন্তরালে থাকিয়া তাঁহার কার্য্য দেখিলাম। তিনি নিবাত-নিষ্কম্প প্রদীপের ন্যায় স্থিরভাবে ধ্যানস্থ হইলেন (১), পশ্চাৎ মৃদুস্বরে ভগবানের স্তব ও প্রার্থনা করিয়া, নিদ্রিত হইলেন। রাত্রি ৩টা না বাজিতেই, গাত্রোত্থান করিয়া পুনরায় ধ্যানস্থ হইয়া, পরে স্তব ও প্রার্থনা করিলেন। পরক্ষণেই (অতিপ্রত্যুষে) পুঁথিপত্র লইয়া প্রস্থান করিলেন। প্রভাতে পরমভক্তিভাবে পুণ্যশ্লোক-গণকে স্মরণ না করিয়া তিনি কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতেন না। নারদ, যাজ্ঞবল্ক্য, জনক, ধ্রুব, প্রহ্লাদ, চৈতন্য, ঈশা, মুষা, নানক, মহম্মদ, রামমোহন, দেবেন্দ্রনাথ, কেশব প্রভৃতি তাঁহার প্রাতঃস্মরণীয়। সর্ব্ব সম্প্রদায়ের বহুতর লোকের আপদে বিপদে, রোগে শোকে সংবাদ লওয়া ও প্রাণপণে সাহায্য করা তাঁহার নিত্য-কর্ম্ম ছিল। অসংখ্য কার্য্যের প্রত্যেকটীকে সমান গুরুতর জ্ঞান করিতেন, এজন্য একটী কার্য্যেও তাঁহার শৈথিল্য কেহ কখনও লক্ষ্য করেন নাই। তাঁহার দান এত গোপনীয় ছিল যে, গ্রহীতা ভিন্ন আর কেহই তাহা জানিতে পারিত না।

তাঁহার ধর্ম্মভাব বড় উদার ছিল। ব্রাহ্মসমাজের অধ্যক্ষ হইয়াও, তিনি ভিন্নধর্ম্মাবলম্বী কাহাকেও স্বধর্ম্মত্যাগের পরামর্শ দেন নাই। বরং বিপদের সময় ভিন্নধর্ম্মাবলম্বীকে স্বধর্ম্মোক্ত শান্তি স্বস্ত্যয়নের পরামর্শ দিতে শুনিয়াছি।

(১) কলিকাতায় 'রায় মহাশয়' নামে একটী অতিবৃদ্ধ পরমযোগী ছিলেন। তাঁহার আশ্চর্য্য জীবনচরিত বলিতে গেলে একখানি বৃহৎ গ্রন্থ হয়। যিনি তাঁহাকে না দেখিয়াছেন, তাঁহাকে তাঁহার প্রভাবের বিষয় বুঝান যায় না। তেমন সাদা-সিধা, সরল, অটল, নির্বিকার, সদানন্দ সাধু আর দেখি নাই। আমি জানিতাম, উমেশচন্দ্র প্রত্যহ কোনও সময় অতি গোপনে তাঁহার নিকট যাইতেন।

তিনি অন্যের বিপদ শুনিলে নিজের বিপদ বিস্মৃত হইতেন। যে সময় তাঁহার প্রাণাধিকা কন্যা বিভুবালার মৃত্যু হইল, সেই সময় তিনি কোনও বন্ধুর বাটীতে পীড়ার সংবাদ পাইয়াই তথায় উপস্থিত হন এবং চিকিৎসাদির ব্যবস্থা করিয়া ও ভীত পরিবারকে আশ্বাস দিয়া যান। যেন তাঁহার নিজের কোনও বিপদ ঘটে নাই। ধন্য সাধুপুরুষ! দয়াময়কে তুমিই চিনিয়াছিলে।

"শোকো নাশয়তে ধৈর্য্যং
শোকো নাশয়তে শ্রুতম্।
শোকো নাশয়তে সর্ব্বং
নাস্তি শোকসমো রিপুঃ ॥"

শোক মানবের ধৈর্য্য ও শাস্ত্রজ্ঞানকে নষ্ট করে, শোকে সকলি নষ্ট হয়, শোকের সমান শত্রু আর নাই। রাম যুধিষ্ঠিরাদি দেবচরিত্রেও ইহার অন্যথা দৃষ্ট হয় নাই। কিন্তু যে দিন উমেশচন্দ্রের সর্ব্বাবস্থায় অনুকূলা পতিপ্রাণা সাবিত্রীসমানা সতী লক্ষ্মী প্রিয়তমা পত্নী পতির চরণরেণু লইয়া বিদায় গ্রহণ করেন, যে দিন তাঁহার প্রাণাধিকা দুহিতা বিভুবালা বিদায় গ্রহণ করেন, সে দিন সে সময় উমেশচন্দ্রের ধৈর্য্য এবং তাৎকালিক কর্ত্তব্যপালনে ঐকান্তিকতা দেখিয়া সকলে বিস্ময়াপন্ন হইয়াছিল। জানি না বিধাতা তাঁহাকে কি উপাদানে নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন।

"একঃ প্রজায়তে জন্তুরেক এব প্রলীয়তে।
একোঽনুভুঙ্‌ক্তে সুকৃতমেক এব হি দুষ্কৃতম্ ॥"

"আত্মনো বন্ধুরাত্মৈব
গতিরাত্মৈব চাত্মনঃ।"

এই সনাতন ঋষিবাক্য উমেশচন্দ্রের পুণ্যময় জীবনের মূলমন্ত্র। এই সার সত্য অবলম্বন করিয়া তিনি স্বাবলম্বন, আত্মসংস্কার ও আধ্যাত্মিক উৎকর্ষলাভে কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন।

নিজ বিবেক ও কর্ত্তব্যনিষ্ঠার নিকট তিনি সহস্র নিগ্রহ নির্য্যাতনকে তৃণজ্ঞান করিতেন। নিগৃহীত করিয়া তাঁহাকে বিচলিত করিতে পারে, এমন লোক অদ্যাপি জন্মগ্রহণ করে নাই। একদা কোনও ব্যক্তি বিদ্বেষবশতঃ অকারণে তাঁহার প্রতি অতি নৃশংস ব্যবহার করে। তিনি নীরবে চলিয়া আসিলেন। কয়েক দিন পরেই তাহার নিকট উপস্থিত হইয়া, অতি কাতরভাবে বলিলেন, ভাই! যদি কোনও অপরাধ করিয়া থাকি, দয়া করিয়া ক্ষমা করুন। সে ব্যক্তির তখন চৈতন্য হইল, সে ভাবিয়া চিন্তিয়া কোনও অপরাধ পাইল না। তখন অনুতপ্ত ও পদানত হইয়া সাশ্রুনয়নে ক্ষমা প্রার্থনা করিল। তাঁহার জীবনে এরূপ ঘটনা অনেকবার ঘটিয়াছে। ব্রাহ্মবিদ্বেষীরা তাঁহার উপর লোমহর্ষণ অত্যাচার করিয়া তাঁহাকে বিন্দুমাত্র বিচলিত করিতে পারে নাই, প্রত্যুত তাঁহার অপূর্ব্ব মাধুর্য্যে মুগ্ধ হইয়া তাঁহার

পদানত হইয়াছিল। ইহার ভূরি ভূরি প্রমাণ বিদ্যমান; বাহুল্যভয়ে উল্লেখ করিলাম না। "শীলেন সর্ব্বে বশাঃ" চরিত্রের নিকট সকলকেই নত হইতে হয়। উমেশচন্দ্রের সহিত আমার পঞ্চাশ বৎসর ঘনিষ্ঠতা। এই দীর্ঘ কালের মধ্যে কখনও তাঁহার মুখে উচ্চ কথা শুনি নাই, তাঁহাতে কোনও চিত্তবিকারের লক্ষণ লক্ষ্য করি নাই।

পাপেঽপ্যপাপঃ পরুষেঽপ্যভিধত্তে প্রিয়াণি যঃ।
মৈত্রীদ্রবান্তঃকরণস্তস্য মুক্তিঃ করে স্থিতা॥

অনিষ্টকারীর প্রতিও যাঁহার নিষ্পাপ ব্যবহার, নিষ্ঠুরভাষীর প্রতিও যাঁহার মধুর সম্ভাষণ, বিশ্বপ্রেমে যাঁহার হৃদয় দ্রবীভূত, মুক্তি তাঁহার হস্তেই। উমেশচন্দ্র জীবন্মুক্ত।

শারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক, সমঞ্জসভাবে এই ত্রিবিধ শিক্ষার পূর্ণতাই মানবের পূর্ণ শিক্ষা। এ দেশের ছাত্রজীবন এই ভাবে গঠিত করিবার জন্য তাঁহার অহরহঃ ঐকান্তিক চেষ্টা ছিল। আমার সঙ্গে যখনি দেখা হইত, এই বিষয়ের কথাই অধিকক্ষণ হইত। এই উদ্দেশ্যসাধনের জন্য সিটিকলেজ ও অন্যান্য বিদ্যালয়ে বহুতর উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন। এই উদ্দেশ্যে এবং প্রধানতঃ তাঁহারি প্রবর্ত্তনায় মৎকৃত সদ্ভাব, শিক্ষা, আশাবাহিনী মঙ্গলগাথা(১), চাণক্যনীতির অভিনব সংস্করণ, শিক্ষাসার, প্রাতঃকৃত্য প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণীত ও প্রচারিত হয়।

কোনও বৃহৎ কার্য্য প্রায়ই সাময়িক ঘটনায় ও তাৎকালিক উত্তেজনায় সম্পন্ন হইয়া থাকে। এজন্য, ঐ সকল ঘটনা দ্বারা লোকচিত্তের যথার্থ স্থায়ী ভাব বুঝা যায় না। মানবের প্রকৃত মহত্ব বা হীনতার পরীক্ষাস্থল,—তাহার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কার্য্য। কোনও ব্যক্তিকে ঠিক্ চিনিতে হইলে, তাহার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কার্য্যগুলির উপর দৃষ্টি রাখা উচিত। আমি পঞ্চাশবর্ষব্যাপী ঘনিষ্ঠতা দ্বারা উমেশচন্দ্রের অসংখ্য ক্ষুদ্র কার্য্য লক্ষ্য করিয়াছি। তিনি যথার্থই মহান্। তাঁহার আভ্যন্তরিক সমস্ত বৃত্তিই মঙ্গলময়ের মাঙ্গলিক ভাবে গঠিত ও পরিপুষ্ট। এ বিষয়ে কয়েকটী দৃষ্টান্ত দিলেই পর্য্যাপ্ত হইবে।

কোনো স্ত্রীলোকের তুলসীবৃক্ষ বিনষ্ট হয়। সে প্রত্যহ উহা পূজা করিয়া জলগ্রহণ করিত। তুলসীবৃক্ষ না পাইলে তাহার আহার হইবে না, ইহা জানিতে পারিয়া, উমেশচন্দ্র তৎক্ষণাৎ পদব্রজে

(১) সিটিকলেজ-গৃহে ছাত্রগণকে লইয়া "আশাবাহিনী" নামে একটী সভা স্থাপিত হয়। ঐ সভার মুখ্য উদ্দেশ্য, ছাত্রজীবনকে প্রকৃত ধর্ম্মভাবে গঠিত করা। ঐ সভায় নিয়মিত দিনে ৺আনন্দমোহন বসু, উমেশচন্দ্র প্রভৃতিকে ও আমাকে গিয়া ছাত্রগণকে উপদেশ দিতে হইত। সর্ব্বজীবে দয়া, মৈত্রী, গুরুভক্তি, শৌচ, উদ্যমশীলতা, ব্যসনবর্জ্জন,—এই কয়টী 'আশাবাহিনী'-সভার সাধনীয় বিষয় ছিল।

বহুদূর গিয়া তাহার জন্য একটী তুলসীবৃক্ষ সংগ্রহ করিয়া স্বহস্তে আনিয়া তাহাকে দিলেন। কোন হিন্দু এ কার্য্য করিলে বিশেষ মহত্ব প্রকাশ পাইত না। কিন্তু সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের একজন কর্ত্তৃপক্ষের এরূপ কার্য্য বিশেষ মহত্বের পরিচায়ক। উমেশচন্দ্র ব্রাহ্মধর্ম্মে অটলবিশ্বাসী হইয়াও অন্যের ধর্ম্মভাবকে সম্মান ও সহানুভূতির চক্ষে দেখিতেন, অন্যের মর্ম্মব্যথা স্বয়ং অনুভব করিয়া কার্য্য করিতেন। এমন ব্যথার ব্যথী, উদার সাধুপুরুষ দুর্লভ। আমি তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া বলিতাম,—এটী "অনাঘ্রাতং পুষ্পম্"; কলির কলুষিত নিঃশ্বাস ইঁহাকে স্পর্শ করে নাই। যদি তাঁহাতে কোনো দোষ থাকে, তবে সে তাঁহার অতিমৃদুতা। তাঁহার অতিমৃদুতা দেখিয়া কেহ কেহ তাঁহার উপর ঔদ্ধত্য প্রকাশে সাহসী হইত।

রোগীর পীড়াশান্তির জন্য তিনি রৌদ্র, বৃষ্টি, শীত, বাত, নিজের পীড়া প্রভৃতি কিছুই গ্রাহ্য করিতেন না। যেরূপে হয় তাহার জন্য ঔষধপথ্যাদি সংগ্রহ করিতেন। তাহার মানসিক শান্তির জন্য পার্শ্বে বসিয়া মধুর ব্রহ্মনাম শুনাইতেন। প্রতি পৌষ মাসে প্রত্যহ রাত্রি থাকিতে উঠিয়া, সহচর সংগ্রহ করিয়া, গৃহে গৃহে তারকব্রহ্মনাম বিতরণ করা তাঁহার জীবনের একটী মহোৎসব ছিল। তিনি ব্রাহ্ম বলিয়া অনেক হিন্দু নিজ বাটীতে ক্রিয়াকলাপে তাঁহাকে আহ্বান করিতে আপত্তি করিতেন না। "অহিংসা পরমো ধর্ম্মঃ" এ বিষয়ে যেমন কাহারও মতভেদ নাই, তেমনি উমেশচন্দ্রের সাধুতা বিষয়ে কাহারও মতভেদ দেখি নাই।

তিনি নানাস্থানের অভাবক্লিষ্ট লোকের সংবাদ রাখিতেন। নানা উপায়ে ও বহুকষ্টে অর্থ ও বস্ত্রাদি সংগ্রহ করিয়া তাহাদিগকে গোপনে সাহায্য করিতেন। আমার ঘনিষ্ঠ আত্মীয়ের বা প্রতিবেশীর হাঁড়ির খপর আমি রাখি না, কিন্তু তাহাদের সহিত নিঃসম্পর্ক হইয়াও, উমেশচন্দ্র তাহাদের জন্য প্রাণপণ করিতেছেন, ইহা জানিতে পারিয়া আমি কতবার আত্মাকে ধিক্কার দিয়াছি। দক্ষিণ অঞ্চলে মজিলপুর, বিষ্ণুপুর, মুড়াগাছা, ডায়মণ্ডহার্বার প্রভৃতি স্থানে ঘোর দুর্ভিক্ষের সময়, উমেশচন্দ্র এবং হরিদাস দত্ত প্রভৃতি মহাত্মারা যাহা করিয়াছেন, তাহা ভাবিলে অবাক্ হইতে হয়। প্রধানতঃ তাঁহাদের চেষ্টায় অসংখ্য মহাপ্রাণী ভীষণ যন্ত্রণা ও মৃত্যুমুখ হইতে রক্ষা পাইয়াছিল। ঐ সময় তাঁহাদের উদ্যোগে "সাহায্য ভাণ্ডার" স্থাপিত হয়।

চব্বিশপরগণার অন্তঃপাতী হরিনাভি-গ্রামে এণ্ট্রান্সস্কুলের প্রধানশিক্ষকরূপে তিনি ঐ স্থানে বহুকাল বাস করেন। ঐ সকল স্থানে উন্মার্গগামী যুবকের সংখ্যা অধিক ছিল। উমেশচন্দ্রের ঐকান্তিক যত্নে ঐ সকল স্থানে নবযুগ প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। তাঁহার সহবাসে ও উপদেশে অনেকেই পুনর্জন্ম লাভ করিয়াছেন। ঐ স্থানের নিরন্ন পরিবারদিগকে সাহায্য

করিতে এবং দরিদ্র ছাত্রদিগের বেতন দিতে তাঁহার নিজের বেতনের টাকা প্রায় নিঃশেষ হইত। ঐ অঞ্চলের লোকেরা তাঁহাকে দেবতার ন্যায় ভক্তি করিয়া থাকে। একদা ঐ প্রদেশে ভীষণ ওলাউঠা মারীভয় উপস্থিত হয়। উমেশচন্দ্র এক সময় কলিকাতা মেডিকেল কলেজের ছাত্র ছিলেন (১)। পরে হোমিওপ্যাথি অধ্যয়ন করেন। তিনি সেই মারীভয়ে আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়া হোমিওপ্যাথি ঔষধের বাক্স বহন-পূর্ব্বক, অহোরাত্র গৃহে গৃহে রোগীদিগকে ঔষধ দান করিতেন। একদা গভীর রজনীতে ঔষধহস্তে দূরবর্ত্তী রোগীর নিকট যাইতেছিলেন। সমস্ত দিন অশ্রান্ত পরিশ্রমে তখন তাঁহার দেহ নিতান্ত ক্লান্ত ও অবসন্ন। চলিতে চলিতে কখন তাঁহার নিদ্রাবেশ হইয়াছিল, তাহা জানিতে পারেন নাই। এই অবস্থায় যাইতে যাইতে ইটের পাঁজায় পড়িয়া মস্তকে গুরুতর আঘাত প্রাপ্ত হন। সংজ্ঞা লাভ করিয়া সেই দারুণ আঘাতকে তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া, রোগীর বাটীতে গিয়া উপস্থিত হন। পরপ্রাণের জন্য নিজ প্রাণকে তুচ্ছ করিয়াছেন, এরূপ ঘটনা তাঁহার জীবনে ভূরি ভূরি।

তিনি অতি শৈশব হইতেই কঠোরতায় ও সহিষ্ণুতায় অভ্যস্ত। স্বাভাবিক ধৈর্য্য, সহিষ্ণুতা, কর্ত্তব্যনিষ্ঠা ও ঈশ্বরে একান্ত অনুরাগ প্রভৃতি গুণে তিনি বিভিন্ন-প্রকৃতি লোকদিগকে লইয়া বহুতর লোকহিতকর কার্য্য করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার নিঃস্বার্থ লোকহিতৈষণার নিকট সকলকেই বাধ্য হইতে হইত। কার্য্যকরী শক্তির মূল উপাদান—নৈতিক উৎকর্ষ। সে উৎকর্ষে তিনি সুসমৃদ্ধ ছিলেন। "উত্তাপঃ সর্ব্বসিদ্ধীনাং প্রত্যূহঃ প্রথমঃ কিল,"—মনের উত্তাপই সর্ব্বসিদ্ধির প্রধান বিঘ্ন। সে উত্তাপ যাবজ্জীবন তাঁহাকে স্পর্শ করে নাই। তিনি দশ বর্ষ বয়সে পিতৃহীন হইয়া কেবল স্বাবলম্বনে শিক্ষিত। বাল্যাবধি বহু কষ্টে ও জননীর কঠোর নিয়মে পালিত ও বর্দ্ধিত বলিয়া অম্লানভাবে সকল কষ্টই সহ্য করিতে পারিতেন। তাঁহার নিজের বেতনাদি বিষয়ে এবং আহার ও পরিচ্ছদাদি বিষয়ে কিরূপ নিঃস্পৃহতা ছিল, তাহা সর্ব্বলোকবিদিত। তাঁহার মাতা-পিতা-পিতামহী-সোদর প্রভৃতির প্রতি ব্যবহার সকলের শিক্ষণীয়। ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করায়, তৎকালে দেশের

(১) ১৮৬০ ও ১৮৬১—এই দুই বৎসর তিনি মেডিকেল কলেজে অধ্যয়ন করেন এবং বিজ্ঞান-শাস্ত্রে অনেক শিক্ষালাভ করেন। অনন্তর তাঁহার জ্যেষ্ঠের দারুণ পীড়া হয়। জ্যেষ্ঠের শিশুসন্তানগুলির সহিত জ্যেষ্ঠকে কলিকাতায় লইয়া আসায় তাঁহার কষ্টের আতিশয্য এবং পাঠের ব্যাঘাত ঘটিল। অতিরিক্ত পরিশ্রমে মস্তকের ও চক্ষুর পীড়ায় তিনি নিরতিশয় কাতর হইলেন। সেই সময়, তাঁহার জীবিকার উপায় অবলম্বনও শেষ হইল। অগত্যা তাঁহাকে মেডিকেল কলেজ ছাড়িতে হইল।

লোকে খড়্গহস্ত হইয়া তাঁহার উপর অমানুষিক অত্যাচার করিয়াছিল। যে সকল অত্যাচারে পর্ব্বতও বিচলিত হয়, হিমশিলাও অগ্নিময় হয়। তিনি সে সকল অত্যাচার যে ভাবে সহ্য করিয়াছিলেন, এবং অত্যাচারীদের প্রতি যেরূপ ব্যবহার করিয়াছিলেন, তাহা ভাবিলে তাঁহাকে দ্বিতীয় যীশুখৃষ্ট বা হরিদাস বলিয়া জ্ঞান হয়। তাঁহার জ্যেষ্ঠ সহোদর ৺অভয়াচরণ সংস্কৃত শাস্ত্রে সুপণ্ডিত, পরোপকারী, পণ্ডিত-মর্য্যাদা-রক্ষক, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ও অতি তেজস্বী পুরুষ ছিলেন। দৈবঘটনায় তিনি উন্মাদগ্রস্ত হইয়াছিলেন। সময়ে সময়ে উন্মাদ এত বৃদ্ধি পাইত যে, তখন তাঁহার দ্বারা আত্মহত্যাদি দুর্ঘটনা ঘটা বিচিত্র নহে। যতদিন তাঁহার ঐ অবস্থা থাকিত, উমেশচন্দ্র ছায়ার ন্যায় তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে থাকিতেন। জ্যেষ্ঠ কর্তৃক গুরুতর প্রহারে জর্জ্জরিত হইয়াও জ্যেষ্ঠকে রক্ষা করিবার জন্য তাঁহার সঙ্গ ছাড়িতেন না।

বিদ্যালয়ের শিক্ষকতা প্রভৃতি কার্য্যোপলক্ষ্যে তিনি যখন যে স্থানে বাস করিয়াছেন, স্থানীয় লোকমাত্রেরি আন্তরিক শ্রদ্ধা ও ভক্তি আকর্ষণ করিয়াছেন। সোমপ্রকাশ প্রভৃতি সংবাদ-পত্রে বহুতর উপাদেয় প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। স্ত্রীলোকদিগের মুখপাত্র পত্রিকা বামাবোধিনীর সম্পাদক তিনিই। তাঁহার প্রচারিত বামাবোধিনীর প্রভাবে অনেক স্ত্রীলোক মহোপকার লাভ করিয়াছেন। বামাগণের সুনীতিগর্ভ প্রবন্ধ ও পুস্তক রচনায় তিনি তাহাদের গুরু ছিলেন বলিলে অত্যুক্তি হয় না। কোনো বামার সুশীলতার পরিচয় পাইলে বা বামারচিত উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ পাইলে তাঁহার আনন্দ ধরিত না। তাঁহার বামাবোধিনী হিন্দু-ব্রাহ্ম-খৃষ্টান প্রভৃতি সকলেরই জন্য উন্মুক্ত। অনেক হিন্দু-মহিলার হিন্দুধর্ম্মবিষয়ক প্রবন্ধ উহাতে প্রকাশিত হইয়া থাকে। প্রতিবর্ষ বামা-বোধিনীর বার্ষিক জন্মোৎসবে বিদুষী রমণীরা তাঁহার গৃহে সাদরে আহূত ও পূজিত হইতেন। বার্ষিক ব্রাহ্মোৎসবে তিনি অনেক লেখিকাকে উপাদেয় ভক্তি-গ্রন্থ উপহার দিতেন।

সিটিকলেজ ও বোবা-কালা-বিদ্যালয়ের মূল পত্তন হইতে বর্ত্তমান সমুন্নতি, প্রধানতঃ উমেশচন্দ্রের চেষ্টার ফল। সিটিকলেজের গৃহনির্ম্মাণ জন্য অনেক টাকা ঋণ ছিল; তিনি নানা স্থান পরিভ্রমণপূর্ব্বক দান সংগ্রহ করিয়া ঋণমোচনের সাহায্য করিয়াছেন। বেথুন কলেজ ও অন্যান্য স্ত্রীবিদ্যালয়ের সহিত তাঁহার ভূয়িষ্ঠ সংযোগ ছিল। ঐ সকলের উন্নতিকল্পে তাঁহার যত্ন ও শ্রমের ইয়ত্তা ছিল না। ইহা ভিন্ন, জয়নগর প্রভৃতি স্থানের স্কুলে, নানাস্থানের ব্রাহ্মমন্দিরে, স্বর্গীয় মহাত্মাদের স্মৃতিরক্ষায়, পাঠাগার, পুস্তকালয়, দাতব্যভাণ্ডার, দাতব্য চিকিৎসালয় প্রভৃতির প্রতিষ্ঠায়, ধর্ম্মানুশীলনক্ষেত্রে উমেশচন্দ্রের সংযোগ ও সহানুভূতি

সকলেই প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। রাত্রি-কালে কয়েক ঘণ্টা মাত্র নিদ্রা যাইতেন, তাহাও তাঁহার অদৃষ্টে সকল দিন ঘটিত না। কার্য্য করাই তাঁহার আরাম বিরাম বা বিশ্রাম ছিল।

তিনি নিজে যাহা কর্ত্তব্য বোধ করিতেন, তাহা স্বয়ং পালন করিতে কোনো বাধা বা কাহারও আপত্তি গ্রাহ্য করিতেন না। ব্রাহ্মসম্প্রদায়ে অসবর্ণ বিবাহ প্রচলিত থাকিলেও, তিনি নিজে অসবর্ণ বিবাহ করেন নাই এবং সোদর বা কন্যাদের অসবর্ণ বিবাহ দেন নাই। ব্রাহ্মবিবাহ, নবরচিত পদ্ধতি অনুসারে হইয়া থাকে। কিন্তু উমেশ-চন্দ্র ঐ নবীন পদ্ধতিতে পরিতৃপ্ত না হইয়া, আমা দ্বারা হিন্দুবিবাহপদ্ধতির উপাদেয় মন্ত্রগুলি সংগ্রহ করিয়া তাহা নিজ কন্যার বিবাহে প্রয়োগ করেন। তিনি আর্য ধর্ম্মের সনাতন সার সত্য অতীব শ্রদ্ধা সহকারে গ্রহণ করিতেন।

সংস্কৃত উপনিষদে তাঁহার ও তাঁহার জ্যেষ্ঠ সহোদর ৺ অভয়াচরণ দত্তের প্রগাঢ় ভক্তি ছিল। ৺অভয়াচরণ সংস্কৃত ভাষায় ব্যুৎপন্ন অপৌত্তলিক হিন্দু ছিলেন। ৺অভয়াচরণ প্রকৃত বৈদান্তিক। আমি তাঁহার রচিত বেদান্তবিষয়ক সংস্কৃত প্রবন্ধ পাঠ করিয়া বিস্মিত হইয়াছিলাম। তিনি সময়ে সময়ে আমাকে সংস্কৃত ভাষায় পত্র লিখিতেন। উমেশচন্দ্র জ্যেষ্ঠের সাহায্যে ও নিজ চেষ্টায় সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করেন। রামায়ণোক্ত সীতা, সুমিত্রা, প্রমীলা, রাম, লক্ষ্মণ, ভরত, গুহক, হনুমান্ প্রভৃতির চরিত্রে তাঁহার অপরিসীম ভক্তি ছিল। চৈতন্য, নিত্যানন্দ ও হরিদাস তাঁহার প্রাণের সামগ্রী ছিল। ঐ সকল চরিত্র বলিতে বা শুনিতে তিনি গদগদ হইতেন। কথকতা, রামায়ণগান, বেহুলা-লখিন্দরের কথা প্রভৃতি সাধারণ শিক্ষোপযোগী প্রাচীন প্রথাগুলি ক্রমে বিলুপ্ত হইতেছে দেখিয়া তিনি যৎপরো-নাস্তি ক্ষোভ প্রকাশ করিতেন। পুস্তক-পাঠ তাহার বাল্যকালের একটী নেশা। তিনি বর্ণপরিচয়ের সঙ্গে সঙ্গে 'কালী-বিলাস' পুস্তক পড়িতে শেখেন। পরে রামায়ণ, মহাভারত, চণ্ডী প্রভৃতি পুঁথি নিজের আমোদের জন্য এবং পাড়ার মেয়েদিগকে শুনাইবার জন্য পড়িতেন। দোল, রথ প্রভৃতি পর্ব্বাহে খেলনা কিনিতে যে পয়সা পাইতেন, তাহাতে পুস্তক কিনিতেন। সকল পুস্তক ক্রয়ের সঙ্গতি না থাকায় হস্তে লিখিয়া লইতেন। একখানি পুস্তক সঙ্গে না লইয়া তিনি কোথাও যাইতেন না। তাঁহার বাল্য-বন্ধু বাবু কেদারনাথ মুখোপাধ্যায়ের বাটীতে গিয়া নানাবিধ পদ্য রচনা করিতেন। তাঁহার বাল্যকালের সে পদ্যগুলি পুস্তকাকারে মুদ্রিত হইয়াছিল। তাঁহার প্রণীত রোমরাজ্যের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস ১৮৫৯ সালে মুদ্রিত হয়। তাঁহার রচিত অনেকগুলি সঙ্গীত সঙ্গীতরত্নাবলীতে প্রকাশিত হয়।

কয়েকখানি বাঙ্গালা পুস্তক পাঠ করিয়া তিনি ইংরাজি শিখিতে অতিমাত্র ব্যগ্র হন। কিন্তু অবস্থাগতিকে প্রথমতঃ সে ইচ্ছা পূর্ণ হয় নাই। তাঁহার মাতৃদেবী পুত্রের নিরতিশয় আগ্রহ দেখিয়া তাঁহাকে কষ্টে শ্রেষ্টে আট আনা বেতন দিয়া ইংরাজি স্কুলে ভর্ত্তি করিলেন। অতীব কষ্টে, কেবল স্বাবলম্বনে ও ঈশ্বরকৃপায় তাঁহার শিক্ষা হইতে লাগিল। তিনি গ্রাম্য বিদ্যালয়ে ও স্বগৃহে কয়েকখানি মাত্র পুস্তক পড়িয়া, পরকীয় সাহায্যে, ভবানীপুরে আসিয়া একেবারে এণ্ট্রান্স ক্লাসে ভর্ত্তি হন এবং সেই বারেই এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া স্কলার্সিপ প্রাপ্ত হন। ক্রমে এল, এ, ও বি এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তিনি দুই বৎসর মেডিকেল কলেজে পড়িয়া বিজ্ঞানবিষয়ে অনেক জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন। অতিমাত্র পীড়া ও অন্যান্য গুরুতর কারণে তাঁহাকে মেডিকেল কলেজ ছাড়িতে হয়। ভবানীপুরে অবস্থানকালে তিনি যথাবিধি ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষিত হন।

প্রেমভক্তিরসাত্মক কাব্যে ও ভগবৎসঙ্গীতে তাঁহার অতুল অনুরাগ ছিল। বৈষ্ণবকবিগণের কাব্য তিনি ভক্তিপূর্ব্বক পাঠ করিতেন। কোথাও সংকীর্ত্তন হইবে জানিলে, তাহা শুনিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিতেন। আমার বাটীতে অনেকবার কীর্ত্তন শুনিয়া অশ্রুপাত করিয়াছেন। ঐ সকল সঙ্গীত হইতে সুন্দর ব্রহ্মভাবের ব্যাখ্যা করিতেন। বৈষ্ণবধর্ম্মের সার কথা—"জীবে দয়া ও নামে রুচি"। এটী তাঁহার জীবনের মূল মন্ত্র ছিল।

"তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ॥"

এই অমূল্য গাথায় তাঁহার প্রাণনাড়ী গ্রথিত ও পরিপুষ্ট। এজন্য তাঁহার জীবনে 'ভিতর,' 'বাহির'—দুইটা, দিক্ ছিল না, তাহা আগাগোড়া, সুখে-দুঃখে, বিপদে-সম্পদে, স্তুতি নিন্দায় অভিন্ন ও অবিকারী।

অনেক বড় লোকের জীবনচরিত প্রকাশ করিতে হইলে অনেক কথা বাদ দিয়া লিখিতে হয়। কেননা, বড় লোকের দোষের কথা প্রকাশ করায় সমাজের অনিষ্ট ভিন্ন ইষ্ট নাই। কিন্তু উমেশচন্দ্রের জীবনে এমন কিছুই ঘটে নাই, যাহা অসঙ্কোচে প্রকাশ করা না যায়। যে চরিত্র শাশ্বত ধর্ম্মমূলে প্রতিষ্ঠিত, তাহা সর্ব্বকালেই সমান পবিত্র। নিরবচ্ছিন্ন লোককল্যাণই তাঁহার সাধনা ছিল। তিনি সারাদিন খাটিয়া শুষ্কমুখে গৃহে আসিয়া দেখিলেন,—নানা কার্য্যের জন্য অনেকে উপস্থিত। মুখে বারিবিন্দু না দিয়াই আবার কার্য্যে লাগিয়া গেলেন। একদিন আমি তাঁহাকে একটু বিশ্রাম করিতে বলায়, তিনি হাস্যমুখে বলিলেন,—"যতক্ষণ পারা যায়, করা যাউক; যাঁহার কার্য্য তিনিই করেন, মনুষ্য নিমিত্তমাত্র।"

পিতা-মাতার গুণেই সুসন্তান হয়। উমেশচন্দ্রের নিঃস্বার্থ, নির্ম্মল, পুণ্যময় জীবন তাঁহার পিতা-মাতার গুণেই গঠিত।

অটল ধর্ম্মনিষ্ঠা, কঠোর শ্রমশীলতা, মিতাচার, শৌচ, সুব্যবস্থা প্রভৃতির গুণে তাঁহার পিতা মাতা সামান্য আয়ে অসাধ্য সাধন করিতেন। সন্তানগুলির সর্ব্বাঙ্গীণ কল্যাণের উপর তাঁহাদের একাগ্রদৃষ্টি ছিল। তাঁহাদের শাসনে কাহারও কোনও অন্যায় কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবার সাহস ছিল না। সন্তানদিগকে কঠোর নিয়মে রক্ষণ ও শিক্ষাদান তাঁহাদের ব্যবস্থা ছিল। তাঁহাদের পরোপকার ও আতিথেয়তা সর্ব্বলোকের শিক্ষণীয়। নিজের যতই অভাব বা বিপদ ঘটুক না কেন, বাটীতে ভিক্ষুক, অতিথি, অভ্যাগত কেহই নিরাশ হইয়া ফেরেন নাই। বাটীর নিকট শবদাহস্থান থাকায় নানা স্থান হইতে শব-সৎকারের জন্য তথায় লোক-সমাগম হইত। তাঁহারা প্রাণপণ যত্নে তাহাদের সাহায্য করিতেন। তাঁহারা গঙ্গামাতৃক স্থানে বাস করায়, দূরস্থ জ্ঞাতি-বন্ধু-আত্মীয়েরা গঙ্গাস্নান, পাল-পার্ব্বণ প্রভৃতি উপলক্ষ্যে প্রায়ই তাঁহাদের বাটীতে আসিত। অনেকে সাংঘাতিক পীড়া লইয়া গঙ্গালাভের জন্য সবান্ধবে তাঁহাদের বাটীতে আসিয়া বাস করিত। তদ্ভিন্ন, কার্য্যোপলক্ষে সম্ভ্রান্ত মুসলমানেরা ও অন্যান্য প্রজারা দলে দলে আসিয়া তাঁহাদের বাটীতে অবস্থান করিত। সকলের মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া আহারাদি দানপূর্ব্বক পরিচর্য্যা করিতে তাঁহারা কখনও পরাঙ্মুখ হন নাই। আতিথ্য ও পরোপকার বিষয়ে তাঁহাদের নিকট জাতিবিচার ছিল না। তাঁহাদের নিজের জন্য নিত্য-ব্যয়ে কড়াকড়ি থাকিলেও, নৈমিত্তিক ব্যয় অনেক হইত। অতিথি, কুটুম্ব ছাড়া কোনও দিন যাইত না। এমন পিতা মাতা না হইলে কি এমন সুসন্তান হয়?

উমেশচন্দ্রের কনিষ্ঠ সোদর দীননাথ দত্ত জয়নগর এণ্ট্রান্স বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক। তিনি প্রাতঃস্মরণীয় ৺ রাজ-নারায়ণ বসুর জামাতা। তাঁহার অমায়িকতায় ও সৌজন্যে মুগ্ধ না হইয়া থাকা যায় না। পিতৃপিতামহক্রমে এ পরিবারের ভদ্রতা চিরপ্রসিদ্ধ। উমেশচন্দ্র চারি পুত্র ও তিন কন্যা রাখিয়া গিয়াছেন। পুত্রকন্যাগুলি পিতামাতার ন্যায় অতি সুশীল ও সচ্চরিত্র। এ পরিবারে কাহারও মুখে কেহ কখনও উচ্চ বা অভদ্র কথা শুনে নাই। বিলাসিতার ছায়াও এ পরিবারকে স্পর্শ করে নাই। পিতৃ-পিতামহাদির ন্যায় ইহারা সকলেই মিতাচারী ও কঠোরতায় অভ্যস্ত।

জীবের জন্ম, কর্ম্ম, মৃত্যু সকলি ব্রহ্ম-কৃপা; সুখ-দুঃখ সকলি ব্রহ্মকৃপা; "অহং করামীতি বৃথাভিমানঃ" আমি করিতেছি, ইহা বৃথা অভিমান। 'ঈশ্বরদেশিতং জগৎ"—সেই সর্ব্বশক্তিমান্ মঙ্গলময়ের ইচ্ছায় এ জগৎ পরিচালিত; একটী পরমাণুরও ক্রিয়া তাঁহার অগোচর নাই। ঈশ্বরে সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া নিষ্কামভাবে পুণ্যানুষ্ঠানই মানবের একমাত্র কর্ত্তব্য,—ইহাই উমেশচন্দ্রের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল।

তিনি ব্রহ্মকৃপা জ্ঞানে মৃত্যুকে অমৃত বোধ করিতেন।

গুরুতর পরিশ্রমে ইদানীং তাঁহার স্বাস্থ্যভঙ্গ হইয়াছিল। এ অবস্থায় সম্পূর্ণ বিশ্রাম লওয়া তাঁহার পক্ষে একান্ত কর্ত্তব্য ছিল। তিনিও তাহা বুঝিতেন, এবং সময়ে সময়ে বিজনে গিয়া বাস করিতেন। কিন্তু নানা কার্য্যের অনুরোধে বিশ্রাম ত্যাগ করিয়া তাঁহাকে কর্ম্মক্ষেত্রে ফিরিতে হইত। তাঁহার স্বাস্থ্যভঙ্গ হইলেও, হঠাৎ যে এ সর্ব্বনাশ ঘটিবে, তাহা স্বপ্নেও ভাবি নাই। তিনি যে চলিয়া গিয়াছেন, হৃদয় এ কথা বিশ্বাস করিতে চায় না। হে দীনবৎসল! হে পরদুঃখকাতর! হে সর্ব্বগুণনিধে! তুমি কি সত্যসত্যই চলিয়া গেলে!

"জায়ন্তে চ ম্রিয়ন্তে চ মাদৃশাঃ ক্ষুদ্রজন্তবঃ।
পরার্থবদ্ধকক্ষাণাং ত্বাদৃশামুদ্ভবঃ কুতঃ॥"

মাদৃশ ক্ষুদ্র প্রাণী কত শত জন্মিতেছে ও মরিতেছে, কিন্তু পরহিতে বদ্ধপরিকর তোমার ন্যায় দেবতা কোথায় পাইব?

হৃতা ত্বয়া শান্তিসুধাপ্রদানৈঃ
শোকাতুরাণাং নয়নাম্বুধারা।
অশ্রূণি হা ত্বদ্বিরহোত্থিতানি
হে জীববন্ধোঽদ্য নিবারয়েৎ কঃ॥

তুমি শান্তিসুধাদানে শোকার্ত্তগণের অশ্রুধারা নিবারণ করিতে। হে জীব-বন্ধো! বল! আজি তোমার বিরহে আমাদের এ অশ্রুধারা কে নিবারণ করিবে?

হে দয়াময়! সচ্চিদানন্দ! জগদীশ! তুমি তোমার হৃদয়ানন্দ পুত্ররত্নকে তোমার শান্তিময় ক্রোড়ে গ্রহণ করিয়াছ। তাহার গুণের পুরস্কার এ জগতে ছিল না, তাই তাহাকে নিজ ক্রোড়ে গ্রহণ করিয়াছ। তাহার নিভৃত নিঃশব্দ প্রার্থনা শ্রবণ করিয়া তাহার চির-জীবনের সাধ পূর্ণ করিয়াছ। তোমার প্রিয় পুত্র অবিরাম তোমার প্রিয় কার্য্য করিয়া নিতান্ত শ্রান্ত, ক্লান্ত, অবসন্ন দেহে, অন্তিমে নিঃশব্দ-নিঃস্পন্দ ভাবে তোমাকেই ডাকিতেছিল। যখন এক-কালে সংজ্ঞালোপ, পুত্রকন্যার দত্ত জলবিন্দু ওষ্ঠপ্রান্তে গড়াইতেছে, নাভিদেশ ঘন ঘন স্পন্দিত, তখন তাহার বদনে 'মা' 'মা' 'মা' এই অমৃতাক্ষর বাহির হইল। শুনিলাম, স্তম্ভিত হইয়া মুখপানে চাহি-লাম, দেখিলাম,—মহাযোগী যোগনিদ্রায় অভিভূত, মুখমণ্ডলে অপূর্ব্ব শান্তি! অপূর্ব্ব মাধুরী! জীবাত্মা দেহপিঞ্জর ভেদ করিয়া ধীরে ধীরে পরমাত্মায় লীন হইতেছে। এ মহাসঙ্গম—এ গম্ভীর দৃশ্য দেখিয়া ভাবে বিহ্বল হইয়া বার বার নমস্কার করিলাম।

হা তে দরিদ্রভরণব্রতমপ্যপূর্ণং
ব্রহ্মামৃতার্পণমহাব্রতমপ্যপূর্ণং।
বামামহোন্নতিমহাব্রতমপ্যপূর্ণং
অস্তং গতোঽসি ধরণীতল-পূর্ণচন্দ্র!॥

হায়! তোমার দরিদ্র-ভরণ-ব্রত পূর্ণ না হইতেই, তোমার ব্রহ্মসুধাদান-ব্রত পূর্ণ না হইতেই, বামাকুলের মহোন্নতিসাধন-মহাব্রত পূর্ণ না হইতেই,

হে ধরাতলের পূর্ণচন্দ্র! তুমি অস্তাচলে গমন করিলে!

হাহাদ্য বঙ্গজননী হৃতরত্নসারা
নিঃস্বার্থলোকহিতমদা নিরাশ্রয়ঞ্চ।
দীনস্য দুর্গতিমনুস্মরতোঽশ্রুসিক্তঃ
গ্রাসঃ স্খলিষ্যতি মুখাৎ পুনরেব কস্য॥

হায়! আজি বঙ্গজননীর সাররত্ন অপহৃত হইল; নিঃস্বার্থ পরোপকার আজি নিরাশ্রয় হইল; দীনহীনের দুঃখ স্মরণ করিয়া আর কার মুখ হইতে অশ্রু-সিক্ত অন্নগ্রাস স্খলিত হইবে?

ব্রহ্মার্পিতেন্দ্রিয়মনোবচনাত্মকর্ম্মা
ভূমামৃতেঽদ্য ভজসে ত্বমনন্তশান্তিম্।
শোচ্যা বয়ং তু নিতরাং যদহন্ ধরায়ো
হীনা অমূল্যনিধিনাপি ভবাদৃশেন॥

কায়-মন-বাক্য, সমস্ত ইন্দ্রিয় ও আত্মাকে পরমব্রহ্মে সমাহিত করিয়া, তুমি আজি তাঁহার অমৃতময় ক্রোড়ে শান্তিলাভ করিয়াছ। কিন্তু হায়! আমরা কি হত-ভাগ্য! আমরা তোমার ন্যায় অমূল্য নিধি হারাইয়াও প্রাণধারণ করিতেছি!

যাতেঽপি দেব! বিলয়ং তব ভৌতকায়ে
ত্বং সর্ব্বলোকহৃদয়ে চিরজীবিতোঽসি।
জাতা ম্রিয়ন্ত ইহ মাদৃশপুণ্যশূন্যাঃ
মৃত্যুঃ কুতো জ্বলদনশ্বরকীর্ত্তিভাজাম্॥

হে দেব! তোমার ভৌতিক দেহ বিলীন হইলেও, সর্ব্বলোকের হৃদয়ে তুমি চির-জীবী হইয়া আছ। এ জগতে জন্মগ্রহণ করিয়া মাদৃশ পুণ্যহীনেরাই মরিয়া থাকে। যাঁহারা জ্বলন্ত অনশ্বর কীর্ত্তিপ্রভায় প্রদীপ্ত, তাঁহাদের মৃত্যু কোথায়?

ক্লেশানসূনপি চিরায় তৃণায় মত্বা
নিত্যং পরোপকৃতয়ে প্রযতিষ্যতে কঃ।
কো বা প্রভূতকরুণাগলদশ্রুনেত্রো
ব্রহ্মামৃতেন শময়িষ্যতি পাপিতাপম্॥

যাবজ্জীবন সমস্ত ক্লেশকে এবং নিজের প্রাণকেও তৃণ জ্ঞান করিয়া, নিরন্তর পরোপকারের জন্য আর কে যত্ন করিবে? প্রভূত করুণায় গলদশ্রুনেত্রে ব্রহ্মনামা-মৃতদানে কে আর পাপিগণের সন্তাপ হরণ করিবে?

যাতে দিবং পিতরি হন্ত গতাসি বামা-
বোধিন্যয়ি ত্বমতিশোচ্যতমামবস্থাম্।
স্বপ্রাণনির্গলিতসাররসেন কো বা
ত্বাং পালয়িষ্যতি পিতেব চ মাতৃকেব॥

বামাবোধিনি! তোমার পিতা স্বর্গে গিয়াছেন, অহো! আজি তোমার কি শোচনীয় দশা! আপনার প্রাণনাড়ীর সারসত্ব নির্গলিত করিয়া, সেই রসে কে আর তোমাকে পোষণ করিবে?

হে মঙ্গলময়! তাপিতের শোক-হারী ঈশ্বর! আজি তোমার প্রিয়পুত্রের শোকার্ত্ত পরিবারে শান্তিবারি বর্ষণ কর! তাহাদের তোমা বিনা আর গতি নাই। তোমার সে প্রিয় পুত্র কেবল তোমাকেই জানিত, তোমাকেই ডাকিত, তোমাকে লইয়াই সকল কর্য্যে করিত, তোমাতেই তাহার সমস্ত নির্ভর; গিরিরাজের ন্যায় সে তোমাতেই অটল ছিল। তাহার সন্তানগণকে শান্তি, পিতৃকীর্ত্তিরক্ষণে শক্তি ও সিদ্ধি দান কর।

হে স্বর্গীয় মহাত্মার পুত্রকন্যাগণ!

আজ এ শোক শুধু তোমাদের নয়, আমাদের সকলেরি। বিদ্যার্থী,ধর্ম্মজিজ্ঞাসু, দীনহীন, অন্ধ, আতুর, বোবা, কালা, নরনারী সকলেই আজি পিতৃহীন। সকলেই তাঁহার শ্রাদ্ধাধিকারী। তিনি জীবনের যে পুণ্যময় সনাতন আদর্শ রাখিয়া গিয়াছেন, তাহার অনুসরণ করাই তাঁহার প্রকৃত শ্রাদ্ধ। অহরহ এ শ্রাদ্ধ করিতে কেহ বিস্মৃত হইও না।

তারাকুমার।

শোকোচ্ছ্বাস।

আজি এ কি শুনিলাম! এ যে শত বজ্র গর্জিয়া মাথার উপরে পড়িল! ভগবন্! এ কি শুনাইলে?

আকাশ অন্ধকার, পৃথিবী অন্ধকার, সমস্ত জ্যোতিষ্ক, সমস্ত আলো একসঙ্গে নিবিয়া গেল! এই ভীষণ অন্ধকারে, ৪ঠা আষাঢ় বুধবারের রাত্রিতে আমরা —বঙ্গজননীর সন্তান আমরা—কি হারাইলাম? আঁধার ঘরে চোর ঢুকিয়া আমাদের কোন্ অমূল্য রত্ন লইয়া গেল? —আমরা বুঝিতে পারিলাম না, খুঁজিতে পারিলাম না, ঠাওরাইতে পারিলাম না, আঁধারে আঁধারে আমাদের সর্ব্বনাশ হইয়া গেল! ভগবন্! এ কি করিলে?

আর কি বলিব, আমার দেশীয় ভগিনীগণ! বামাবোধিনী পত্রিকার লেখিকা ও পাঠিকাগণ! আর কি বলিব, আজি আমাদের সকলেরই সর্ব্বনাশ হইয়াছে, আমরা সকলেই পিতৃহীনা হইয়াছি। যিনি আমাদের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সুহৃৎ, যিনি আমাদের সর্ব্বাঙ্গীণ হিতৈষী, যিনি আমাদের সর্ব্বাপেক্ষা আত্মীয়, আমাদের সেই পিতৃস্থানীয় ভক্তিভাজন বামাবোধিনীসম্পাদক মহাশয় এ জগতে আর নাই! যিনি নিয়ত স্ত্রীজাতির কল্যাণ চিন্তা করিয়াছেন, স্ত্রীজাতির উপকার করা যাঁহার এক প্রধান ব্রত, স্ত্রীজাতির সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতির জন্য যিনি আত্মোৎসর্গ করিয়াছেন, সেই করুণাময় নরদেবতা এ জগতে আর নাই! বঙ্গবাসিনীদিগের পক্ষে এমন সর্ব্বনাশের কথা আর কি আছে জানি না।—যখন পঞ্চাশৎ বর্ষ পূর্ব্বে এ দেশে "স্ত্রীজাতির উন্নতি" অন্ধকারসমুদ্রে মগ্ন ছিল, তখনও স্ত্রীশিক্ষা প্রচলনের জন্য যিনি একান্ত যত্ন ও চেষ্টা করিয়াছেন, অন্তঃপুরশিক্ষা, বেথুন কলেজ, ব্রাহ্ম বিদ্যালয়, বিধবা-আশ্রম প্রভৃতি যিনি প্রভূত অনুরাগে পরিচালন ও তত্ত্বাবধান করিয়াছেন, এই পঞ্চচত্বারিংশ বর্ষ যিনি স্ত্রীজাতিকে জ্ঞান ধর্ম্মে ভূষিত করিবার জন্য বামাবোধিনী পত্রিকা পরিচালনা করিয়াছেন, আমাদের সুখ-দুঃখে যাঁহার হৃদয়পূর্ণ সহানুভূতি, আমরা যখন নিতান্ত অবহেলনীয়া এবং নগণ্যা ছিলাম, তখনও যিনি আমাদিগকে একান্ত শ্রদ্ধা, বিশ্বাস এবং সম্মানের পবিত্র চক্ষে

দর্শন করিয়াছেন, তখনও যিনি "কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ" বুঝিয়া তদনুসরণ করিয়াছেন, আমাদের সেই ব্যথার ব্যথী, শুভাকাঙ্ক্ষী চিরসুহৃদ্ আমাদিগকে এ জনমের মত ছাড়িয়া গিয়াছেন!—এ হেন হৃদয়বিদারক ঘটনা আমাদের আর কি আছে? দেশের পুরুষগণও আজি তাঁহার বিয়োগে কাতর—যার পর নাই কাতর হইয়াছেন এবং তাঁহার অভাব সর্ব্বত্র অনুভব করিতেছেন। তিনি সহস্র কর্ম্মে লিপ্ত কর্ম্মযোগী ছিলেন; দেশের বর্ত্তমান প্রায় সকল সাধুকর্ম্মের মূলে তিনি কোথাও উদ্যোগী, কোথাও পরামর্শদাতা, কোথাও নেতা, এইরূপ দেখা যায়। সিটি কলেজ, স্মৃতি-সভা-সমিতি, কালা-বোবা স্কুল, মাইকেল মধুসূদন দত্তের স্মৃতি-স্তম্ভ-প্রতিষ্ঠা, অনাথবন্ধু সমিতি, সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজ, সঙ্গীত-সমাজ, সঙ্গত সভা, হরিনাভি ব্রাহ্ম সমাজ, ব্রাহ্ম বিদ্যালয়, হেয়ার প্রাইজ ফণ্ড, গিরিশ বিদ্যারত্ন দাতব্য ফণ্ড, প্রভৃতি লোকহিতকর বহুবিধ কার্য্যভার তিনিই সম্পন্ন করিয়াছেন। আজি সেই কর্ম্মযোগীর অভাবে বঙ্গভূমি যেন শূন্যময় শ্মশান হইয়াছে। তাঁহার কথা কোন্‌টী ছাড়িয়া কোন্‌টী বলিব? এত কাজে নিযুক্ত থাকিয়াও তিনি রোগীর শুশ্রূষা, শোকীর সান্ত্বনা, বিপন্নের সহায়তা এবং আত্মীয়বন্ধুদিগকে আপ্যায়িত করিতে সর্ব্বক্ষণই প্রস্তুত ছিলেন। সেই চির-প্রসন্নতাপূর্ণ পবিত্র সস্মিত মুখ দেখিলে যেন প্রাণের সকল জ্বালা জুড়াইয়া যাইত। তাই বলিতেছি, সেই ভগবৎ-নিষ্ঠ সাধু, সেই জিতাত্মা জিতেন্দ্রিয়, সেই ধৈর্য্য-সহিষ্ণুতার প্রতিরূপ, সেই সংযমী, দয়ালু, অনলস, উদ্যোগী, সেই ন্যায়নিষ্ঠ কর্ত্তব্য-পরায়ণ, সেই ক্ষমাশীল দয়াময় প্রেমময়, সেই পাপ-স্পর্শমাত্র-পরিশূন্য পুণ্যবান্, সেই ঋষিপ্রতিম বিশ্বহিতৈষী, সর্ব্বগুণান্বিত আদর্শ চরিত্রবান্, পুত্র রত্ন হারাইয়া বঙ্গজননী আজি জগতের কাঙ্গালিনী হইয়াছে! এমন সর্ব্বনাশ মানুষের প্রাণে কি করিয়া সহিবে? ভগবন্! এ যে সহিষ্ণুতার অধিক শোক চাপাইলে, করিলে কি?

আজি যে কত কথা মনে পড়িতেছে, তাঁহার গুণের কথা কোন্‌টী রাখিয়া কোন্‌টী বলিব? মনে পড়িতেছে,—তিনি জ্ঞানে, গুণে, ধর্ম্মে কর্ম্মে এতাধিক শ্রেষ্ঠ হইয়াও কোন দিন আত্মপ্রকাশ করিতে চাহেন নাই; তাঁহার ধর্ম্ম প্রাণতায় তাঁহার চরিত্রের নির্ম্মলতায় এবং তাঁহার লোকাতীত মহত্ত্বে সকলেই সর্ব্বত্র তাঁহাকে শ্রেষ্ঠ আসন দান করিতেন, কিন্তু হায়! সে বিনীত বীর কেবল লুকাইয়া কাজ করিতে চাহিতেন। আমরা জানি, তিনি যেমন ব্রাহ্মের কাছে প্রকৃত ব্রাহ্ম, সেইরূপ হিন্দুর কাছে তিনি আদর্শ হিন্দু, খ্রীষ্টান, মোস্‌লেম প্রভৃতি ধর্ম্মোপাসকদিগের কাছে তিনি যথার্থ ধার্ম্মিক জ্ঞানে সম্মানিত ও সমাদৃত, কিন্তু তাঁহার নিজের কাছে তিনি ভগবৎ-সেবক মাত্র। তাই

তিনি এত গৌরবান্বিত হইয়াও আত্ম-গৌরব-বিমুখ। তিনি কি না সত্য সত্যই স্বরাজ, তাই পরের কাছে আত্ম-প্রতিষ্ঠা করিবার তাঁহার কোনও প্রয়োজন হয় নাই। আরও মনে পড়িতেছে তাঁহার স্থৈর্য্য! সর্ব্বংসহা মা বসুমতীর মত স্থৈর্য্য বুঝি তাঁহারই ছিল! তিনি সকলের দুঃখ সাধিয়া গ্রহণ করিতেন, নিজের হৃদয়পূর্ণ সহানুভূতি ঢালিয়া পরের বুকের জ্বালা জুড়াইয়া দিতেন, কিন্তু রোগ শোক ভয় বা ভাবনায় কোন দিন তাঁহাকে অস্থির দেখি নাই, সেই ভগবৎ-পদে সমর্পিত চিত্তের প্রসন্নতা কদাপি বিনষ্ট হয় নাই। সহধর্ম্মিণী-বিয়োগে, কন্যা-বিয়োগে সেই সহৃদয় স্নেহপ্রবণ মহাত্মার প্রাণে কি নিদারুণ আঘাত লাগিয়াছিল, সকলেই অনুভব করুন, কিন্তু সে নরদেবতার তখনও স্থিরতা! নিজের দারুণ রোগ, যাতনা, শরীর আর রক্ষা হয় না, তথাপি তাঁহার সেই স্থিরতা! শুনিয়াছি, জীবনের শেষ মুহূর্ত্তেও তিনি আজীবনের মত স্থির, ধীর এবং সংযত! হায়! এমন দেবতাকে আমরা পাইয়া হারাইলাম! তাঁহার গুণের কথা কোনটা ছাড়িয়া কোনটা মনে করিব? শুনিয়াছি নর-দেবতা রামচন্দ্রের গুণে অজ্ঞান পশু ও হিংস্র রাক্ষস পর্য্যন্ত বশীভূত ছিল। স্বচক্ষে দেখিয়াছি আমাদের পূজনীয় মহাত্মার গুণে পশুর অধম মূর্খ, রাক্ষস অপেক্ষা ভয়ানক শত্রু পর্য্যন্ত মুগ্ধ হইয়াছে! (হায়! তাঁহাকে দেবতা বলিয়া এতদিন বুঝিতে পারি নাই!—তিনি স্নেহময় পিতা, তিনি শুভাকাঙ্ক্ষী গুরু, তিনি চির বিশ্বাসী সুহৃদ্ হইয়া আমাদিগকে ভুলাইয়া রাখিয়াছিলেন। তাঁহার দেবত্বের কথা ভাবিবার অবকাশ পাই নাই, তাই তো কাঁদিয়া মরিতেছি!) তাঁহাকে "মানব" বলিলে তাঁহার অখ্যাতি হইবে, তিনি সত্য সত্যই দেবতা। আজি তাঁহার শূন্য আসনে বসিবার মত আর কাহাকেও যে দেখিতেছি না! কি বলিব! আমরা বঙ্গবাসিনীগণ সেই স্নেহময় আত্মীয়-তমকে হারাইলাম, বলিয়াই এমন করিয়া বুক ফাটিতেছে! এই হতভাগিনীদিগের জন্য যাঁহারা প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াছেন, একে একে সকলেই প্রায় চলিয়া গেলেন, এখন, কাহার ভরসায় বুক বাঁধিব?—ভগবান্! এ কি করিলে? হায়! এ কি হইল!

এই সময়ে আমি আমার নিজের কাহিনী একটুকু না বলিয়া থাকিতে পারিতেছি না। অনেক দিন আগে আমি যখন মহাভারতের মৌষল পর্ব্ব পড়িয়াছিলাম, তখন মনে হইয়াছিল, যিনি অর্জ্জুনের জীবন-পরিচালক, একাধারে যিনি অর্জ্জুনের আচার্য্য, মন্ত্রী, পিতা ও বন্ধু, যিনি অর্জ্জুনের বল, বুদ্ধি, সাহস ও ভরসা, অধিক কি যাঁহার জীবিতে অর্জ্জুন জীবিত, সেই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যখন চলিয়া গেলেন, তখন অর্জ্জুন জীবিত রহিলেন কিরূপে? হায়, তখন আমি স্বপ্নেও জানিতাম না যে, সুদূর ভবিষ্যতে ভগবান্ এই অভাগিনীর

জন্য সেইরূপ এক ভীষণতম পরীক্ষার আয়োজন করিয়া রাখিয়াছেন! অতি তরুণ বয়সে যখন এ জীবনের আশা-আলোক নিবিয়া গিয়াছিল, যখন সমস্ত জীবনের পরিপূর্ণ ব্যর্থতা আমাকে লক্ষ্য-হীন, উদ্দেশ্যহীন করিয়া ফেলিয়াছিল, সেই দারুণ সময়ে বামাবোধিনীর ভিতর দিয়া এক দেবতার করুণাপূর্ণ কোমল হস্ত আমাকে ভীষণ অন্ধকার হইতে তুলিয়া আনিল। আমি বুঝিলাম, ইনি মানব নহেন দেবতা; পর নহেন, স্নেহময় পিতা; অন্য কিছু নহেন, এই বজ্রাহত হৃদয়ে বিধাতার অমৃতময় আশীর্ব্বাদ। তার পরে এই দ্বাবিংশতি বর্ষ পর্য্যন্ত তাঁহার কাছে যে স্নেহ মমতা, যে আদর যত্ন, যে উৎসাহ উপদেশ এবং যে আনন্দ শান্তি লাভ করিয়াছি, তাহা আমার প্রাণের প্রতি অণু ও পরমাণুতে সঞ্চিত হইয়া আছে, প্রকাশ করিবার ভাষা আমি জানি না। এই সুদীর্ঘ দিনের মধ্যে এক তিলের জন্য তাঁহাকে বিরক্ত হইতে দেখি নাই বা তাঁহার মধুময় প্রকৃতির অন্যথা ঘটে নাই! রোগ শোক প্রভৃতি যে কোন সময়ে তাঁহার কাছে গিয়াছি, আমার সকল জ্বালা জুড়াইয়া দিয়াছেন।

শাস্ত্রে বলে "এ সংসারে সাধুসঙ্গই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ তপস্যা"। সেই দেবের সঙ্গই আমার প্রকৃত সাধুসঙ্গ ছিল; তাঁহার চরণতলে বসিয়া যাহা বুঝিয়াছি, তাহা কোন তীর্থ দর্শনে বুঝি নাই, জ্ঞানীর উপদেশে বুঝি নাই, গীতা ভাগবতে বুঝি নাই। তাঁহার চরণতলে বসিয়া বুঝিয়াছি যে, জগতে সত্য সত্যই নিষ্কাম ধর্ম্ম আছে, নিঃস্বার্থ হিতৈষণা আছে; বুঝিয়াছি যে, পরোপকারই শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম, ভগবৎ-পদে আত্মোৎসর্গ করিয়া সকল অবস্থায় অনুষ্ঠেয় কার্য্য সম্পন্ন করাই শ্রেষ্ঠ কর্ত্তব্য; বুঝিয়াছি, যে ঘৃণিত, যে দলিত, যে অপরাধী, তাহাকেও "আমার" বলা যায়। শত্রুকেও প্রীতি করা যায়, সর্ব্ব জীবকেই ভাল বাসা যায়; বুঝিয়াছি মহাযোগী মহাদেবের মত আকন্দ, ধুতুরা ফুলেও প্রীত, ভূত পিশাচেও স্নেহবান্, ভোগ-সুখেও নিঃস্পৃহ, বিশ্বহিত-নিরত মনুষ্যরত্ন সময়ে সময়ে জগতে জন্মিয়া থাকেন, বুঝিয়াছি সাধুসঙ্গই জগতে ত্রিতাপ-জ্বালা দূর করে। যেমন সূর্য্যের আলোকে কাচখণ্ড উজ্জ্বল হইয়া উঠে, তাঁহার পবিত্র কিরণে এ মলিন চিত্তও তেমনি আলোকিত হইয়া উঠিত। হায়! জানিতাম না যে, এ সৌভাগ্য আমার ফুরাইয়া আসিতেছে! যখন ১৩১৩ সালের অগ্রহায়ণ মাসে তাঁহার পদধূলি লইয়া চলিয়া আসি, তখনও জানিতাম না যে, জন্মের মত প্রণাম করিলাম! কি পবিত্র ধর্ম্মোপদেশে, কি সাহিত্য-ক্ষেত্রে, কি পারিবারিক জীবনে সকল দিকেই তিনি সুপিতা হইয়া আমার জীবনের পরি-চালক ছিলেন, তাঁহার কাছে "সঙ্কোচ" আমার মনেও পড়িত না।—অধিক কি, তাঁহার বাড়ীই আমার "স্নেহভবন" বলিয়া আমার ধারণা।—তাই বলিতেছি, মৌসল-

পর্ব্ব-কথিত শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র চলিয়া গেলে অর্জ্জুন তাঁহার জীবনের অবশিষ্টাংশ কিরূপ জীবন্মৃত অবস্থায় কাটাইয়াছিলেন, তাহা আজি আমি নিজ হৃদয়মধ্যে অনুভব করিতে পারিতেছি।

আহা পিতঃ! স্নেহময়,করুণাময়,মমতাময় পিতঃ! একবার চাহিয়া দেখ, তোমার অভাবে দেশে কি সর্ব্বনাশ হইয়াছে! তোমার স্নেহের ধন সন্তানেরা পিতৃমাতৃহীন, তোমার বন্ধুবান্ধবগণ আশা-ভরসাহীন, তোমার বঙ্গবামাকুল অবলম্বনহীন, এবং বামাবোধিনী জীবনী-শক্তি-হীন হইয়া পড়িয়াছে। মরণ আমাদের চির-পরিচিত, মরণ আমাদের নিত্য সহচর; কিন্তু তোমাকে কাড়িয়া লইয়া মরণ আমাদের যে ক্ষতি, যে সর্ব্বনাশ করিল, শত শত বৎসরেও বুঝি তাহার আর পূরণ হইবে না। তোমার ৬৭ বৎসর মাত্র বয়সে আমরা তোমাকে হারাইলাম; কিন্তু তোমার মত মানবরত্নের, তোমার মত নর-দেবতার কি এই বয়সই যথেষ্ট? তুমি শতাধিক বর্ষ মাতৃ-কোল আলো করিলে না কেন? মাতৃ-ভূমি শতাধিক বর্ষ তোমার গৌরবে গৌরবান্বিত হইল না কেন? এত শীঘ্র আমরা তোমার শোক পাইলাম কেন? হায় রে! কত চাপা দিতে চাহিতেছি, কিন্তু এ শূন্যতা, এ অভাব যে কিছুতেই পূর্ণ হইতেছে না! জানি পিতঃ! তুমি শোকের অতীত।—জানি পিতঃ! তুমি যেখানে আছ, স্বর্গ সেইখানেই। দেখিয়াছি, যেখানে তুমি থাক, সেখানে রোগ থাকে না, শোক থাকে না, জরা থাকে না, পাপ থাকে না, কোন সন্তাপই থাকে না; বুঝিতেছি সে অজ্ঞাত দেশে সকলেই তোমার মত ধার্ম্মিক,তোমার মত সহৃদয়, তোমার মত পবিত্রতম। বুঝিতেছি, ভগবান্ তাঁহার নির্ম্মল, নিষ্পাপ, বিশ্বস্ত পুত্রকে আজি সেই পুণ্যবতী দেবী, স্বর্গবাসিনী সহধর্ম্মিণীর সহিত, স্নেহের কন্যা বিভুবালার সহিত মিলিত করিয়া উপযুক্ত পুরস্কারদানে কৃতার্থ করিতেছেন—কিন্তু হায়! স্বার্থপর আমরা বলিব কি?—তোমার স্নেহ, তোমার দয়া এবং তোমার সহায়তা হারাইয়া এ পৃথিবী মরুভূমির মত শুষ্ক, মরুভূমির মত হৃদয়হীন এবং মরুভূমির মত ভয়ানক বোধ হইতেছে! নয়নের মণি, অঞ্চলের রত্ন, অদৃষ্টের সৌভাগ্য স্বরূপ তোমা হেন পুত্র হারাইয়া বঙ্গজননী জগতের দ্বারে কাঙ্গালিনী হইয়াছে; সাধুতা অনাথা হইয়া পড়িয়াছে। মানবের সৌভাগ্য অতি নশ্বর, তাই আমরা তোমাকে হারাইলাম! "তোমাকে হরাইলাম" বলিতে বুক ফাটিয়া যায়! দেব! ভগবানের মত তুমিও আমাদের অন্তস্তলে বিরাজমান হও; ভগবানের মত তোমার পবিত্র জ্যোতিতে আমাদের প্রাণ অমৃতময় কর; তোমার মহাপ্রাণে আমাদিগকে অনুপ্রাণিত কর; প্রত্যক্ষেই হউক, আর পরোক্ষেই হউক, সমগ্র বঙ্গবাসিনী তোমারই শিষ্যা, তোমারই কন্যা এবং তোমারই হস্তগঠিতা; আজি তুমি যে লোকেই থাক, আমাদের এই চতুর্থী-

কৃত্য, এই ভক্তি-পূর্ণ প্রণাম গ্রহণ করিয়া আমাদিগকে কৃতার্থ কর।—
"পিতা ধর্ম্মঃ পিতা স্বর্গঃ পিতা হি পরমং তপঃ।
পিতরি প্রীতিমাপন্নে প্রীয়ন্তে সর্ব্ব-দেবতাঃ॥"

প্রণতা স্নেহের কন্যা
অভাগিনী শ্রীমা—।

তুমি নাই?

("বামাবোধিনী"-সম্পাদক, দেবকল্প পূজ্যপাদ৺উমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের স্বর্গারোহণ উপলক্ষ্যে শোকোচ্ছ্বাস)।

"তুমি নাই?"—বিশ্বাস না হয়,
সত্য কি গো! এই জনরব?
ও কথায় অন্তরমাঝারে
কি শূন্যতা করি অনুভব!
সেই সৌম্য মূরতি তোমার,
শিশুসম সরল প্রকৃতি,
আর কি গো! হেরিব না কভু?
—সব হ'ল অতীতের স্মৃতি?
কি করিয়া বুঝাইব প্রাণে
সান্ত্বনা যে মানে না হৃদয়,
"তুমি নাই," এ নিঠুর বাণী
কোন্ প্রাণে করিব প্রত্যয়?
"তুমি নাই?"—সে কেমন কথা!
বেশী দিন হয় নাই গত,
লভিয়াছি শেষ আশীর্ব্বাদ
তব পদে শির করি নত।
হাসি-মুখে কত সমাদরে,
করেছিলে স্নেহ-সম্ভাষণ,
এখনো তা বাজিছে শ্রবণে,
"তুমি নাই,"—এ কথা কেমন?

"তুমি নাই" বল না তা'হ'লে
কি হইবে আমা সবাকার?
শোকে-দুঃখে আপদে বিপদে
কার কাছে দাঁড়াইব আর?
বসি কার চরণছায়ায়
শুনিব সে আশ্বাস-বচন?
কার স্নেহ-উপদেশ-বাণী
জুড়াইবে তাপিত জীবন?
"তুমি নাই?"—বল না তা'হ'লে
কি হইবে মূকবধিরের?
তাহাদের দুরদশা হেরি
দয়া হবে কোন্ হৃদয়ের?
কে গো! আর বাড়ী বাড়ী গিয়া
আপনার শত কাজ ফেলে,
(বিধাতার আশীর্ব্বাদ সম)
কোলে নিয়া বোবা-কালা ছেলে,
সযতনে আনি বিদ্যালয়ে
খুলে দিয়ে রুদ্ধ কণ্ঠ তার
শিখাইবে "মা" "মা" "বাবা" বুলি?
তুমি বিনা এত দয়া কার?

কত মূক, কত কালা ছেলে
বেঁচে থেকে ছিল মৃতবৎ,
হাতে ধরে তুমি তা'সবারে
দেখায়েছ দীপ্ত ভবিষ্যৎ!
"তুমি নাই"—বল না তা হ'লে
কি হইবে "বামাবোধিনীর"?
কে মুছাবে করুণ অন্তরে
রমণীর নয়নের নীর?
অতি ভীতা সঙ্কুচিতা যত
অন্তঃপুরবাসিনী ললনা,
তাহাদের উচ্চ শিক্ষা দিতে
তুমি বিনা কে আছে বল না?
সুপ্ত বিশ্ব, নিবিড় নিশীথে,
পরিজন সকলে নিদ্রিত,
ক্ষুদ্র এক বাতায়নকোণে
ক্ষুদ্র দীপ করি আলোকিত,
বিকম্পিত অন্তরে রমণী
লিখিতেছে ছোট দুটী কথা,
কে গো! তারে উৎসাহ দেখাতে
সযতনে নিবে সে বারতা?
"তুমি নাই"—বলনা তাহ'লে
কি হইবে "সিটিকলেজের?
তব সম প্রাণ পাত করি
কে খাটিবে? তার নয়নের
শুকায়নি আজো অশ্রুকণা
চ'লে গেছে আনন্দমোহন,
তুমিও চলিলে যদি দেব,
কে "কলেজ" রাখিবে এখন?
"তুমি নাই"—বল না তাহ'লে
কে রাখিবে "অনাথ-সমিতি"?
তোমা বিনা অনাথ অধমে
আর কার হবে হেন প্রীতি?
"তুমি নাই,"—বল না তাহ'লে
কি করিবে শিশু "সুকুমার"?
একাকী সে কেমন করিয়া
পালিবে বিশাল পরিবার?
বহুদিন হয়েছে অতীত
পায় নাই জননীর স্নেহ!
একা তুমি ছিলে পিতা মাতা!
আজ তার রহিল না কেহ!
এত দিন স্নেহ-পক্ষপুটে
রেখেছিলে ঢাকিয়া যতনে,
আজ এই সংসারের ভার
একাকী সে বহিবে কেমনে?
"তুমি নাই,"—বল না তাহ'লে
কি করিবে ছোট শিশুগুলি,
সন্ধ্যাকালে কে দিবে তাদের
মুছাইয়া কাদা-মাটি-ধূলি?
মার মত নিকটে বসিয়া
কে সহিবে শত আবদার?
কোন্ প্রাণে ফেলে গেলে তুমি
ভগ্না, রুগ্না তনয়া তোমার?
"তুমি নাই"—শুনিলে এ কথা
রোধিতে পারি না অশ্রুধার,
বুক যেন খালি মনে হয়,—
মর্ম্ম ভেদি উঠে হাহাকার!
ভাবি যবে, আর এ জগতে
পাইব না তব দরশন,—
নিরাশ্বাসে ভেঙ্গে আসে বুক,
বিষাদে আচ্ছন্ন করে মন!
যাও দেব! ত্রিদিবদুয়ারে
দাঁড়াইয়া আকুলনয়নে,

পত্নী তব পথ চেয়ে আছে,
তোর গিয়া প্রেম-সম্ভাষণে!
স্নেহময়ী "বিভুবালা" ওই,
দাঁড়াইয়া পদপাশে যার,
কি উল্লাসে আছে পথ চেয়ে,—
আজ তুমি কাছে যাবে তার!

যাও দেব!—থাক্ ধরণীর
শোক তাপ আমাদের লাগি,
শান্তি হোক্ অন্তরে তোমার,
বিভুপদে এই ভিক্ষা মাগি!

শ্রীমতী শর্ম্মিষ্ঠা চন্দ,
দাকুপী, খুলনা।

মহাত্মা উমেশচন্দ্র দত্ত বামাবোধিনী-সম্পাদক মহাশয়ের
স্বর্গারোহণ উপলক্ষ্যে—

শোকোচ্ছ্বাস।

আজ আমি মর্ম্মান্তিক দুঃখের সহিত বামাবোধিনীর সমস্ত গ্রাহক গ্রাহিকা, পাঠক পাঠিকা ও সর্ব্বসাধারণকে জানাইতেছি যে, বামাবোধিনীর সম্পাদক মহাত্মা উমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় ১৯ শে জুন বুধবার, রাত্রি ১০ ঘটিকা ৫০ মিনিটের সময়, দুই দিবস মাত্র রোগযন্ত্রণা ভোগ করিয়া এক পরম আনন্দময় ধামে চলিয়া গিয়াছেন। বঙ্গভূমির প্রিয়পুত্র, সিটী-কলেজের প্রিন্সিপ্যাল, অবলাকুলের পরম-বন্ধু, সর্ব্বসাধারণের পরম আত্মীয় মহাত্মা উমেশচন্দ্র যথার্থই স্বর্গে গিয়াছেন। তিনি সদা স্নেহময়, সদা হাস্যময় ছিলেন। তিনি নির্ব্বিকার ও নিত্যানন্দ-স্বরূপ ছিলেন। তাঁহার চরিত্র নিষ্পাপ, নির্ম্মল ও নিষ্কলঙ্ক ছিল। তিনি নিষ্কাম ও নিঃস্বার্থ ভাবে সমস্ত জগদ্বাসীর হিত-কামনায় আপনার সমস্ত সুখশান্তি বিতরণ করিয়াছিলেন, সুতরাং তাঁহার আত্মা স্বর্গেরই অধিকারী।

এই মহাপুরুষ অকাল মৃত্যুর করাল কবলে নিপতিত হন নাই। তাঁহার স্বর্গারোহণের উপযুক্ত সময় না হইলেও সময় হইয়াছিল, কিন্তু এই দীর্ঘকালের মধ্যে স্ত্রী ও বিভুবালা-নাম্নী একমাত্র কন্যার শোক ব্যতীত অন্য কোন শোক তাঁহার পবিত্র হৃদয় স্পর্শ করিতে পারে নাই।

স্ত্রীর আত্মার সহিত তাঁহার আত্মা অভিন্ন ছিল। কিন্তু সেই স্ত্রীর বিয়োগের পর কেহই তাঁহার কোনরূপ শোকচিহ্ন লক্ষ্য করিতে পারে নাই। যে কন্যাকে তিনি বি, এ, পর্য্যন্ত পড়াইয়াছিলেন, সেই কন্যার লোকান্তরগমনেও তাঁহাকে কেহ রোদন করিতে দেখে নাই। বরং কন্যার জীবনান্ত হওয়ার পরক্ষণেই

তিনি সেই বিষম দুঃখের সংবাদ সমস্ত আত্মীয়বর্গকে জানাইয়াছিলেন। তাঁহার মত জ্ঞানী, সাধু, সদাচারী, জিতেন্দ্রিয় ও সত্যবাদী সন্তানকে হারাইয়া বঙ্গমাতা আজ ঘোর বিষাদে বিষাদময়ী। সেই জগদ্বিখ্যাত সাধুর অপার অনুগ্রহ,সেই পিতৃস্থানীয় মহাত্মার অপার স্নেহ হারাইয়া আজ সহস্র সহস্র নর নারী নিদারুণ মর্ম্মব্যথায় ব্যথিত। মহাত্মা উমেশচন্দ্র কতশত নরনারীকে মর্ত্ত্য হইতে স্বর্গে তুলিয়াছেন, স্বর্গ হইতে স্বর্গান্তরে লইয়া গিয়াছেন। মহাত্মা উমেশচন্দ্র কত শত জ্ঞানহীন নরনারীর অন্ধকারময় হৃদয়গর্ভে উজ্জ্বল জ্ঞানের আলোক প্রজ্বলিত করিয়া দিয়াছেন। কত শত বিদ্যাহীন ও বিদ্যাহীনাকে বিদ্যারত্নে বিভূষিতা করিয়াছেন।

মহাদেবতুল্য উমেশচন্দ্র নিজে অনন্ত অসংখ্য গুণাবলীতে বিভূষিত ছিলেন, ধর্ম্মই তাঁহার জীবনের সার ছিল। তিনি তাঁহার সন্তানসন্ততিদিগকেও সেই বিমল ধর্ম্মে অনুপ্রাণিত করিয়া গিয়াছেন। সাধু ব্যক্তির মধ্যে অনেক ব্যক্তিকেই ভাগ্যহীন দেখা যায়। কিন্তু ইঁনি যেন নিজ পুণ্যবলেই চির ভাগ্যবান্ বলিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। এ বৃদ্ধকালেও তিনি চারি পুত্র, তিন কন্যা এবং জামাতা ও দৌহিত্র সকল রাখিয়া গিয়াছেন। এমন ষোল-কলা-সম্পূর্ণ জ্ঞানবান্, পুণ্যবান্ আর কয় জন আছে?

কেমন করিয়া সহিবে? বল বঙ্গবাসিগণ! তাঁহার এই বিষম শোক তোমরা কেমন করিয়া সহিবে? সহিতে কি পারিবে? না—এ যে অসহ্য। এমন মহাত্মা জগতে যতদিন ছিলেন, ততদিন মঙ্গল ছিল। আর তিনি নাই, সে মঙ্গল আর ফিরিয়া আসিবে না। হায় কি হইল! অকস্মাৎ বজ্রাঘাত হইয়া বঙ্গমাতার উচ্চ মস্তক চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া গেল। দেশময় বিষম হাহাকার উত্থিত হইল। বিষম শোক-সমুদ্র উথলিয়া উঠিল। হায় রে বিধাতঃ! কি করিলি? এমন করিয়া দেশের লোকের মাথায় বজ্রাঘাত করিলি, এমন রত্ন কাড়িয়া নিলি! বিদ্যার্থিনী, জ্ঞানার্থিনী অবলাকুলকে অকূল পাথারে ভাসাইয়া দিলি! কে আর তাহাদিগকে গুরুর মত জ্ঞানদান করিবে? কে আর তাহাদিগকে পিতার মত বিদ্যা ও মাতার মত গৃহকর্ম্ম শিখাইবে? হায়! অবলাবান্ধব উমেশচন্দ্র আজ কোথায়? হায়! নারীগণের চিরমঙ্গলার্থী উমেশচন্দ্র আজ আর এ জগতে নাই। হায়! বামাবোধিনি! তুমি আজ নিরাশ্রয়, নিঃসম্বল। পিতৃমাতৃভ্রাতৃহীনার ন্যায় রোরুদ্যমানা। হায় কৈলাসকামিনি! তোমার চির আদরের ধন, বামাবোধিনীর চিরসম্বল উমেশচন্দ্র আজ চিরদিনের মত অন্তর্হিত হইলেন, বামাবোধিনীর মুখের দিকে আর কে চাহিবে? হায়! সিটী-কলেজ! তোমার প্রিন্সিপ্যাল আজ কোথায় গেলেন? হায়, কলিকাতা-বাসিগণ! উমেশ চন্দ্র দত্ত আজ কোথায় গেলেন?

তিনি স্বর্গে গিয়াছেন, ঐ যে মহর্ষিতুল্য পরম পবিত্র উমেশচন্দ্রের আত্মা স্বর্গের আলোকে উদ্ভাসিত হইয়া সমধিক শোভা ধারণ করিয়াছেন।

এস! বামাবোধিনীর পাঠক পাঠিকা, গ্রাহক গ্রাহিকা, লেখক, লেখিকাগণ! এস আমরা আজ সকলে একত্র হইয়া ঈশ্বরের নিকট সেই মহাপুরুষের অক্ষয় স্বর্গ প্রার্থনা করি, তিনি স্বর্গে গিয়াছেন তাহাতে আর আমাদের দুঃখ কি! আমরা ত এ জীবনে তাঁহাকে ভুলিতে পারিব না, তাঁহার সেই সৌম্যমূর্ত্তি এখনো ত চক্ষে চক্ষে দেখিতে পাইতেছি! এখনও প্রতি মুহূর্ত্তে তাঁহার পবিত্র প্রীতি ভোগ করিতেছি। তিনি স্বর্গের লোক স্বর্গে গিয়াছেন। কিছু দিনের জন্য স্বর্গের আলোকে ধরা অনুরঞ্জিত করিয়াছিলেন। এখন তিনি নাই, কিন্তু ধরাতলে চিরদিন সে আলোর প্রতিচ্ছায়া স্পষ্ট পরিলক্ষিত হইবে।

মর্ম্মাহতা

অম্বুজাসুন্দরী।

প্রার্থনা।

ভগ্নীগণ!

আজি বামাবোধিনীর মহাশোকের দিন। যিনি ইহার স্রষ্টা, পালয়িতা, সেই শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় আজ কোথায়? এত কাল তিনি অশ্রান্ত অক্লান্ত ভাবে নারীকুলের শুভ কামনা করিয়া নানা বিঘ্ন বাধা সত্ত্বেও অক্ষুণ্ণভাবে এই পত্রিকা চালাইয়াছেন। যে সময়ে স্ত্রীলোকদিগের জন্য কোন প্রকার মাসিক পত্রিকার সৃষ্টি হয় নাই, সেই সময়ে ইহার জন্ম হয়। আমাদের জননী হইতে আমরা ইহার গ্রাহিকা, অতএব এই বামাবোধিনী আমাদিগের অতি পুরাতন বন্ধু।

যাঁহার প্রবর্ত্তনায়, যাঁহার পরিশ্রমে আমরা নানাপ্রকারে জ্ঞান লাভ করিয়াছি, যিনি বিশেষরূপে নারীজাতির উচ্চ-শিক্ষাকাঙ্ক্ষী হইয়া দেশে বিদেশে, ঘরে বাহিরে, আত্মপরভেদাভেদে, আন্তরিক চেষ্টা ও যত্ন সহকারে কার্য্য সাধন করিয়াছেন, আজ তিনি অনন্তধামে!

আমরা সকলে একদিন এই সংসারতাপ-ক্লিষ্ট জীবনের অবসানে তথায় গিয়া মিলিত হইব। কিন্তু এই উপস্থিত জাগতিক বিচ্যুতি আমাদের বড় ব্যথা আনিয়া দেয়। আমরা এই দেহাশ্রিত অবস্থায় ভীষণ শোক প্রাপ্ত হইয়া মর্ম্মে মর্ম্মে চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া পড়ি। আমাদের অখণ্ড আত্মার কোন প্রকার বিনাশ হয় না জানিয়াও এই অপ্রত্যক্ষীভূত কারণে বিহ্বল হইয়া পড়ি। তাই আজ স্বর্গীয় পুণ্যাত্মার অভাবে তীব্র দুঃখ ঘটিয়াছে। তাঁহার উপকার স্মরণ করিয়া তাঁহাকে

হারাইয়া সকলে অশ্রুধারায় অঞ্জলি পূর্ণ করিয়া দেবাদিদেবের চরণে উৎসর্গ করিয়া শান্তি পাইব।

এমন উজ্জ্বল রত্ন-হারা হইয়া মাতৃভূমির সেবার আজ কত বিঘ্ন ঘটিল! সে ক্ষতি কি আমাদের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ দ্বারা পূর্ণ হইতে পারে? আমরা সকলে মিলিয়া সেই মহাত্মার উদ্দেশে ঘরে ঘরে প্রাণে প্রাণে পূজা করিব, যেন তাঁহার অক্ষয় স্বর্গভোগ হয়। ঈশ্বর যেন সেই দেবচরিত্র পিতার ব্যথিত ও শোকসন্তপ্ত পুত্রকন্যাদিগের অন্তঃকরণে পরম করুণাধারা ঢালিয়া শান্তি দান করেন এবং "বামাবোধিনী"কে সবল করিয়া অক্ষুণ্ণভাবে জীবিত রাখেন। বামাবোধিনীর পাঠিকা ভগ্নীগণ! একবার সমস্বরে সেই মহান্ ভূমা অনন্তদেবের চরণে প্রণিপাত করিয়া করযোড়ে ভিক্ষা প্রার্থনা কর, আমাদের স্বদেশের প্রিয় পুত্র ৺ উমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের আত্মার উন্নতি হউক; তিনি পরমা গতি লাভ করুন। তাঁহার অক্ষয়কীর্ত্তি তাঁহাকে এ সংসার হইতে কখন অন্তরিত হইতে দিবে না। তিনি নিজেই নিজের সুকৃতিফলে বঙ্গভূমির শ্যামল বক্ষে শোভমান থাকিবেন। তাঁহার সকল সদ্‌গুণের মধ্যে রমণীগণের উন্নতির জন্য তাঁহার যেমন ঐকান্তিক চেষ্টা ও যত্ন ছিল, এরূপ অতি বিরল; এ জন্য বিশেষ করিয়া মহিলাগণ তাঁহার অভাব অনুভব করিবেন। কিন্তু যাঁহার সন্তান, তিনি ডাকিলে কাহার সাধ্য তিলমাত্র অপেক্ষা করে। সর্ব্বকর্ম্ম অসমাপ্ত রাখিয়া, দিবসে নিশীথে, ঘরে বাহিরে, স্থানে অস্থানে, যে স্থানে যে কালে যে ভাবে থাকি না কেন, ফেলিয়া চলিয়া যাইতে হইবে। পিতা, মাতা, পুত্র, কন্যা বা ধন সম্পত্তির কালাকালের কিছু বাধা বিঘ্ন মানিলে চলিবে না। তাই আজ এমন কর্ম্মবীর সংসার পরিত্যাগ করিলেন। আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে উপলব্ধি হয় যে, এমন ধার্ম্মিক মহাপুরুষ জগতে যতদিন থাকেন, ততই মঙ্গলসাধন হয়। কিন্তু দেবতার ইচ্ছা মনুষ্যের ইচ্ছার বিপরীত, তাই আমরা প্রত্যহ সংসারে যেন কত অসামঞ্জস্য ভোগ করিতেছি। ভগবান্ যেমন দুর্জ্ঞেয়, তদনুরূপ তাঁহার কার্য্য সকলও অতি জটিল। আমরা অজ্ঞান, মহামোহান্ধ, তাই এত হাহাকার! এই শোকাভিনয়ে কত লোমহর্ষণ হৃদয়-বিদারক শোচনীয় অবস্থা ঘটিতেছে।

এই পিতৃহারা অনাথ পুত্রকন্যাগণের হৃদয়-বিপ্লবের কি অন্ত আছে? মানুষের সহস্র সহানুভূতিতে কি এ আগুন নির্ব্বাণ হইতে পারে? কেবল সেই অবিনাশী অব্যয় অক্ষয় পরব্রহ্মের অলৌকিক অসাধারণ মহিমান্বিত শক্তি আসিয়া রক্ষা করিবে মাত্র! আমরা তাঁহারই মহীয়সী আশ্চর্য্য ক্ষমতার দিকে প্রত্যাশিত হইয়া থাকি মাত্র। আইস ভগ্নীগণ! আমরা গলায় গলায় বাঁধিয়া বামাবোধিনীর শোকে সহানুভূতি প্রদান করি। পরদুঃখে যে চক্ষে অশ্রুধারা না পতিত হয়, সে চক্ষু মানবচক্ষু

নহে। এক্ষণে আমাদের আরও একটী কর্ত্তব্য এই যে স্বর্গীয় উমেশচন্দ্র দত্ত, মহাশয়ের স্মৃতিরক্ষা। কিন্তু তিনি যে প্রকার আড়ম্বরহীন বিশুদ্ধাত্মা ছিলেন, তাঁহার কীর্ত্তি রক্ষা করিলেই তাঁহার স্মৃতি রক্ষা করা হইবে। তিনি স্ত্রীশিক্ষার পরম পক্ষপাতী ছিলেন, অতএব বামাবোধিনীর সহৃদয়া পাঠিকা-গণের উচিত উহারই বিস্তারের জন্য সচেষ্ট হওয়া এবং অতিপ্রিয় বামাবোধিনীকে সযত্নে রক্ষা করা এবং সর্ব্বতোভাবে উন্নতির পথে লইয়া যাওয়া; ইহাতেই তাঁহার সম্মান রক্ষা এবং প্রিয়কার্য্য সাধন করিয়া জগতে তাঁহার কীর্ত্তি ঘোষণা করা হইবে।

বঙ্গভূমিতে বিস্তর শিক্ষিতা উদারান্তঃ-করণা মহিলা আছেন। তাঁহাদের নিকটেও আমার এই বিনীত নিবেদন যে, পরলোক-গত মহাত্মার অক্ষয়কীর্ত্তি যেন মহিলা-কুলের দ্বারা সুরক্ষিত হয়। আমরা প্রবাসী হইয়াও তাঁহার দয়া হইতে বঞ্চিত হই নাই, তাই আজ শোকতপ্ত প্রাণে পরম পিতার পদপ্রান্তে দেবাত্মার শোকার্ত্ত পরিবারের শান্তি প্রার্থনা করিতেছি এবং বামাবোধিনীর মঙ্গলার্থ যথাসাধ্য চেষ্টা ও যত্ন করিবার জন্য প্রস্তুত আছি। সেই পুণ্য-ময় জীবনের ছায়া যেন আমাদের দেশকে উজ্জ্বল করিয়া থাকে। তিনি যেরূপ স্বার্থহীনভাবে সৎকার্য্য করিয়া বেড়াইতেন, সেইরূপ উচ্চ আদর্শ গঠিয়া আমাদের কার্য্য সম্পাদন করা কর্ত্তব্য। আশা করি, এ অধমজনের প্রস্তাব সর্ব্ববাদিসম্মত হইবে। হরি ওঁ শান্তি।

শ্রী নিস্তারিণী দেবী
মনোজবারচয়িত্রী।

মহিলা-স্মৃতি-সভা*,

১৩৯ ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

১

কে বলে গো দেব! তুমি নাহি এ ধরায়?
কে বলে ছেড়েছো তুমি দুঃখী অনাথায়?
অই শত ভগ্ন প্রাণ, কার বলে বলীয়ান্,
ধন্যবাদ-ভরে শির দিতেছে নমিয়া?
কে বলে গো দেব! তুমি গিয়েছ ত্যজিয়া?

২

কে বলে গো দেব! তুমি নাহি এ ধরায়?
কে বিতরে আজি বল এই অনাথায়?
বিধাতার বরপুত্র, পুণ্যবান্ সুচরিত্র,
চিরতরে শুভস্মৃতি থাকিবে বজায়,
কে বলে ছেড়েছ তুমি দুঃখী অনাথায়?

* গত ১৯শে জুলাই শুক্রবার পরলোকগত বামাবোধিনীসম্পাদক উমেশচন্দ্রদত্ত মহাশয়ের স্মরণার্থ এক মহিলাসভা হয়, তাহাতে অনেকগুলি বিদুষী মহিলা সমবেত হইয়া স্বর্গীয় মহাত্মার স্মৃতিচিহ্ন রক্ষার বিষয় আলোচনা করেন।

৩

কে বলে গো দেব তুমি নাহি গো ধরায়?
ব্রাহ্মধর্ম্ম কার আজি নিশান উড়ায়?
"পাপী তাপী অবহেলে, অমরায় যাবে চলে,"
এই যে উদার প্রেম ঢেলেছো ধরায়,
অই শত মহাপাপী ঘোষে সেই জয়।

৪

কে বলে সাধুর বাঞ্ছা বিফলেতে যায়?
কে বলে ধনেই শুধু সব লব্ধ হয়?
সাধনা যে সিদ্ধিমূল, কে বলিবে ইহা ভুল?
ও পূত জীবনমাখা এরি পরিচয়,
কে বলে ধনেই শুধু সব লব্ধ হয়?

৫

তুমি ত ভিখারী ছিলে কিবা ক্ষতি তায়?
শত লক্ষ ধনে ছিল পূর্ণ ও হৃদয়,
দেখিয়াছি যোগাসনে, বসিয়া কর্ম্মীর সনে,
কত জ্ঞান কত পুণ্য ঢেলেছো ধরায়,
তুমি ত ভিখারী ছিলে কিবা ক্ষতি তায়?

৬

কে বলে ধর্ম্মের বল খাটে না হেথায়?
প্রাণপাত যে সাধনা কভু বৃথা যায়?
বিশাল কার্য্যের ক্ষেত্র, অই হোথা সুবিস্তৃত,
অবিশ্বাসী মানবের ভাঙ্গিতে সংশয়
বিশ্বাসী জীবন তব থাকিবে অক্ষয়।

৭

কে বলে গো দেব তুমি নাহি এ ধরায়?
যেই ধর্ম্ম বিলায়েছ কে মুছিবে তায়?
সতত প্রফুল্লমন, প্রভুপদে অনুক্ষণ,
আপনাকে সমর্পিয়া লভিলে বিজয়
ও পূত জীবন শুধু বিশ্বাস ছড়ায়।

৮

কে বলে গো দেব তুমি নাহি এ ধরায়?
কাহার আশীষ পাই ধমনী শিরায়?
ধর্ম্মযুদ্ধে মহাবীর, কর্ম্মক্ষেত্রে অতি ধীর,
অটল পর্ব্বত সম বিপদের ঘায়,
সম্ভব এতই গুণ শুধু দেবতায়।

৯

কে বলে গো দেব তুমি নাহি গো ধরায়?
অই যে কর্ম্মের ক্ষেত্র ঘোষে কার জয়?
পাপী তাপী অভাজন, কিবা সাধু পুণ্যবান্,
সবারে শীতল কোলে দিয়াছ আশ্রয়,
সম্ভবে এতই গুণ শুধু দেবতায়।

১০

কে বলে ধর্ম্মের বল খাটে না হেথায়?
'ব্রহ্মকৃপাহি কেবলং' মন্ত্র বৃথা যায়?
বিশাল এ ধরণীতে, অই শত পরাণেতে,
কি শুভ্র জ্যোতির আভা বিকাশে হেথায়
কে বলে ধর্ম্মের বল খাটে না ধরায়?

১১

কে বলে ধর্ম্মের কথা কভু বৃথা যায়?
কে বলে যোগীর বল—শেষ কল্পনায়?
অই ত আদর্শ প্রাণ, আছে চির নিদর্শন,
সাধনাতে সিদ্ধিলাভ সাধুর বচন,
মহাঋষি! জীবনেতে দিয়াছ প্রমাণ।

১২

সর্ব্বোপরি দেব তুমি হয়ে মহাবীর,
রচিয়াছ সিংহাসন ভারত-নারীর
হৃদয়ের অভ্যন্তরে, মরমের স্তরে স্তরে,
অমর অজেয় নব থাকিবে বজায়
সেই মহাসিংহাসন, কে ভাঙ্গিবে তায়?

১৪

কে বলে গো দেব তুমি নাহিগো ধরায় ?
মলয় কাহার এত সুবাস ছড়ায় ?
অভাগিনী নারী তরে, প্রাণপাত অকাতরে,
যেতেছে তাহারা অই তব বন্দনায়,
কার প্রভা তারা আজি হেথায় ছড়ায় ?

১৪

কে বলে, নারীর বন্ধো ! নাহিক হেথায় ?
অই দেখ নারীকুল তব পরিচয় ;
(তাহারা) তোমারি হাতের গড়া,
তোমারি আশীষ-ভরা,
জ্ঞান-বলে বলবতী এ পাপ ধরায়
কণ্টকের বনে তারা অই চলে যায়।

১৫

কি বলে পূজিব মোরা থাকহে মাথায়,
নিত্য নব বল দাও দুঃখী অনাথায় ;
আবিলতা তেয়াগিয়ে, বিবেক বৈরাগ্য লয়ে,
যে সব নারীর দল চলেছে ধরায়,
তুমি দেব হোয়ো হোয়ো তাদের সহায়।

১৬

কি বলিব আর দেব ? এ পরাণ চায়
পেতে সেই মহামন্ত্র, যে ব'লে ধরায়
এত ধর্ম্ম সমাপন, পুণ্যরাশি বিতরণ,
করিয়ে হইলে জয়ী ঘোর তপস্যায়,
সবে দাও সেই মন্ত্র, এ মিনতি পায়।

১৭

কে বলে গো দেব তুমি নাহিক ধরায় ?
স্বদেশ-সেবক কোথা হেন দেখা যায় ?
যত কিছু আবিলতা, আবর্জ্জনা কুটিলতা,
ছুঁতেও না পেলে তোমা কম সাধনায় ?
মহাঋষি সিদ্ধি পেলে এ পাপ ধরায়।

১৮

ভালই হয়েছে দেব গেছ অমরায়,
কার্য্যসিদ্ধি হয়ে গেছে মলিন ধরায় ;
(সেই)
মহারাজা পাশে তব, রয়েছে আসন নব,
হোথা হতে সুবাস যে আসিছে হেথায়,
ভালই হয়েছে সুখে আছ অমরায়।

১৯

তাঁহার বিধান "ভাল" বলিব নির্ভয়ে,
"ভালই" তাঁহার বজ্র যেতে হবে সয়ে ;
তিনি মঙ্গলের মূল, এতে কিছু নাহি ভুল,
"তাঁহার বিধান ভাল, মানিতেই হবে,"
বৃথা হাহাকার কেন কান্দে এই ভবে ?

২০

থাক থাক সুখে থাক মাথার উপর,
অনুক্ষণ ভাঙ্গা প্রাণে আশীষ বিতর ;
হৃদয়ের বন্ধু সনে, অমরার সে উদ্যানে,
চিরতরে হইয়াছে শুভ সম্মিলন,
গুরো গো আমার তরে রেখ কিছু স্থান।

স্বর্ণপ্রভা বসু।

প্রয়াণ।

১

হে তাপস! আজি তুমি করিলে প্রয়াণ।
হেথাকার যজ্ঞক্রিয়া,
এবে বুঝি সমাপিয়া,
করিলে অনন্তধামে সমাধি-শয়ান,
পার্থিব পিপাসা হ'তে পাইলে হে ত্রাণ।

২

হে তাপস! আজি তুমি করিলে প্রয়াণ।
এ ধরার তপোবনে,
পেলে না সাধন ধনে,
শান্তির বিজন বনে লভিলে হে স্থান।
প্রেমানন্দে তৃপ্ত মনে হলো দিব্য জ্ঞান।

৩

হে তাপস! আজি তুমি করিলে প্রয়াণ।
শুদ্ধ শান্ত স্থিরমতি,
পরদুঃখে দুঃখী অতি,
দয়ার অলন্তমূর্ত্তি হৃদয় মহান্।
দেবতা মানব-দেশে মহা গরীয়ান্॥

৪

হে তাপস! আজি তুমি করিলে প্রয়াণ।
মাতৃভূমি হলো শূন্য
হারায়ে সুপুত্র পুণ্য,
যাঁর তরে ছিল ধন্য স্বদেশ সম্মান।
মহাব্রত ছিল তব পরের কল্যাণ।

৫

হে তাপস! আজি তুমি করিলে প্রয়াণ।
পরম ধর্ম্মাত্মা হয়ে,
সবে ধর্ম্ম বিতরিয়ে,
শিখাইলে নীতিশিক্ষা হয়ে ভক্তিমান্।
উচ্চ নীচ নর নারী সকল সমান।

৬

হে তাপস! আজি তুমি করিলে প্রয়াণ।
অশ্রান্ত অক্লান্ত ভাবে,
সেবিলে সবে নীরবে,
নাহি ছিল কোন আড়ম্বর অনুষ্ঠান,
গোপনে গোপনে পুণ্য হতো সমাধান।

৭

হে তাপস! আজি কোথা করিলে প্রয়াণ
নিষ্কলঙ্ক দিবাকর,
ধর্ম্ম পুণ্যে মনোহর,
বিদ্যাপ্রিয় অনুরাগী দূরিত অজ্ঞান।
বহুদর্শী চিন্তাশীল বিনয়ী সুজন।

৮

হে তাপস! আজি কোথা করিলে প্রয়াণ?
আর কে রমণীকুলে
স্থাপিবে উন্নতি-মূলে,
উচ্চ শিক্ষা সুসম্মানে করিবে পূজন।
তনয়া সোদরা সম করিবে যতন।

৯

হে তাপস! আজি কোথা করিলে প্রয়াণ?
বামার উন্নতি তরে,
সৃজি বামাবোধিনীরে,
পতি পত্নী দোঁহে মিলি সাধিলে কল্যাণ,
ধন্য স্বদেশের প্রেম মহা অতুলন!

১০

আজি তোমা-হারা হয়ে হলো ভগ্ন প্রাণ,
ছিল স্নেহ কুশলী চিত্ত
যাহাদের তরে নিত্য
পুত্র কন্যা ভাই বন্ধু ভগিনী সমান।
শিক্ষা দীক্ষা দিয়া আর কে বাড়াবে মান?

১১

বহুগুণযুত জ্ঞানী সুধীর সুজন।
তোমা তরে হে উমেশ,
কাঁদিছে বিদেশ দেশ,
ঘরে ঘরে অশ্রুজলে ভাসে দুনয়ন।
কিবা নর কিবা নারী শোকতপ্তমন।

১২

বঙ্গের উজ্জ্বল রবি হে সত্যরঞ্জন!
বাণী লক্ষ্মী শচীরাণী,
করিতেছে উলুধ্বনি,
আজিকে অমরাভূমে অমরশোভন।
মহর্ষি রাজর্ষি সিদ্ধ করে সম্ভাষণ।

১৩

ব্রহ্মপদ লাভ করি মুক্ত দেহ মন।
আপন সুকৃতিফলে,
ধন্য ইহ পরকালে,
বিজয়ী পুরুষ সম করিলে গমন।
গৃহসংসারের সুখ করিয়া বর্জ্জন।

১৪

আমরা অগ্রজপদে করিয়ে বরণ
দিব ভক্তি পুষ্পাঞ্জলি,
সবে ভাই বোন মিলি,
দেবের চরণে তব সুগতি কারণ।
দেহের পতনে নহে আত্মার মরণ।

শ্রীমনোজবারচয়িত্রী।

ভ্রাতা উমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের স্বর্গারোহণ উপলক্ষ্যে

ভগিনীর বিলাপ।

১

হা দাদা, তোমারে ছাড়ি এখন ধরায়
জীবিত রয়েছি আমি,
কোথায় গিয়েছ তুমি?
আজি আমি শান্তিহারা, পথহারা প্রায়।

২

কার সনে গেছ তুমি, আছ কোন্ থানে?
কে তোমারে নিয়ে গেছে,
গেছ তুমি কার কাছে,
এ স্নেহের ভগিনীরে আছে কি স্মরণে?

৩

যেথানে যখন তুমি করিতে গমন,
সর্ব্বাগ্রে বলিতে মোরে,
আজি কেন অনাদরে,
ভগিনীরে একেবারে করিলে বর্জ্জন।

৪

ওহে ভ্রাতঃ স্নেহময়! তোমারে ছাড়িয়া
কেমনে বাঁচিব আমি,
কেমনে বা রবে তুমি
এ স্নেহের ভগিনীকে চক্ষে না দেখিয়া।

৫

যেথানে যখন থাক, মাস দুই পরে
আসিয়া আমার কাছে,
দেখ কে কেমন আছে,
আজি কেন তেয়াগিয়া গেলে অনাদরে?

৬

শুভাকাঙ্ক্ষী ভ্রাতা তুমি আমার কল্যাণে
খাটিয়াছ নিশি দিন,
আজ আমি ভাগ্যহীন,
এখন রয়েছি তোমা সঁপিয়া শমনে।

৭

কোথায় গিয়েছ দাদা, কেন দাদা গেলে?
উষা, শান্ত, চারুশীলা,
আজো খেলে ধূলাখেলা,
তারা কি বাঁচিবে আহা বাবাহারা হ'লে।

৮

শিশু সুকুমার আজ ভ্রাতা ভগ্নী সহ
কাঁদিছে ধূলায় পড়ি,
দিয়ে কত গড়াগড়ি,
সন্তোষ, আনন্দ, মণি কাঁদে অহরহ।

৯

পিতৃস্নেহে মাতৃশোক ভুলেছিল তারা,
আজ তারা ভাগ্যহীন,
আজ তারা বিমলিন,
এক সঙ্গে হলো আজ পিতৃমাতৃহারা।

১০

মাতৃহীন শিশুগণে কোলে পিঠে করে
মানুষ করিয়াছিলে,
এবে ফেলি শোকানলে,
চির জনমের মত দূরে গেলে সরে।

১১

তোমাকেই শিশুগণ মা বলিয়া জানে,
তুমিও মায়ের মত,
যতন করিতে কত,
কিরূপে আনন্দ, মণি বাঁচিবে পরাণে?

১২

ফিরে এস ভ্রাতৃবর! ফিরে এস ঘরে,
দেবতার মত তুমি,
সম তব স্বর্গ, ভূমি,
মুনিরা জীবন মৃত্যু সম জ্ঞান করে।

১৩

যেও না পরের দেশে ফিরে এস ভাই!
চির রোগা উষা মেয়ে
তব কোলে মাথা থুয়ে
বাঁচিত, এখন আর কোন আশা নাই।

১৪

পীড়িতা কন্যাকে নিয়ে সদা সর্ব্বক্ষণ
স্বাস্থ্য হেতু দেশে দেশে
ভ্রমিতে কতই ক্লেশে,
সে চিরকুমার দশা কি হবে এখন?

১৫

কে জানেগো ভ্রাতঃ, তুমি এমন করিয়া
এত শীঘ্র যাবে চলে,
বিপদসাগরে ফেলে,
প্রিয় বন্ধুগণে—প্রাণ পাষাণে বাঁধিয়া।

১৬

সংখ্যাতীত গুণ তব ছিল গুণময়!
জানিতে বিভুর তত্ত্ব,
তাই তাতে ছিলে মত্ত,
সংসার-আশ্রমে থাকি রাজর্ষির প্রায়।

১৭

জগৎ হইল অন্ধ তোমার বিহনে,
শত শত নর নারী,
কাঁদিছে করুণা করি
ঝরিছে শোকাশ্রুধারা পশুরও নয়নে।

১৮

উঠিল জগৎব্যাপী হাহাকারধ্বনি!
খুঁজিছে সমস্ত দেশ,
হা উমেশ,—হা উমেশ!
বামাবোধিনীর শিরে পড়িল অশনি।

১৯

বামাবোধিনীর যত লেখক লেখিকা,
সকলি বাপের মত,
সম্মান করিত কত,
আদরে ছাপিতে তুমি সবাকার লেখা।

২০

অবলাকুলের বন্ধু তুমি মহাশয়!
তব সম পরহিতে,
কে পারে পরাণ দিতে,
ও হো হো, এ শোকবহ্নি নিবিবার নয়।

২১

যাও তবে যাও ওহে অমূল্যরতন!
যদিও তোমার তরে,
কাঁদিব জীবনভরে,
সদা ভ্রাতৃ-শোকানলে হইব দহন।

২২

তথাপি তোমারে আজি দিতেছি বিদায়,
পাষাণে বাঁধিয়া হিয়া;
যাও ভ্রাতঃ! স্বর্গে গিয়া
সস্ত্রীক হইয়া থাক দেবতার পায়।

তোমার স্নেহের ভগিনী—
অম্বুজা।

স্বর্গীয় মহাত্মা উমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের মৃত্যু উপলক্ষ্যে,—

শোকগাথা।

(১)

দুরদৃষ্ট বঙ্গ-মার! অঙ্ক হতে আজি তাঁর,
অকালে করাল কাল চির তরে হায়!—
সহসা লইল হরি, মাতৃ-অঙ্ক শূন্য করি,
মহাত্মা উমেশচন্দ্র হে দেব! তোমায়!

(২)

ব্রহ্মনিষ্ঠ, ধর্ম্মপ্রাণ, নির্ব্বিরোধী, ন্যায়বান্,
দেশভক্ত, সুবিদ্বান্, বঙ্গের সন্তান;
দেশকার্য্যে দেহ মন করেছিলে সমর্পণ,
দেশের উন্নতি তরে তুমি হে মহান্!

(৩)

তব শোকে নিমগন বঙ্গবাসী সর্ব্বজন,
কাঁদিছে আকুল প্রাণে করি হাহাকার;
জগতের কোন্ পারে,
কোথা গেলে কোন্ ধারে?
বিষম বিষাদে বঙ্গ করি অন্ধকার?

(৪)

তব হৃদয়ের ধন, প্রিয় পুত্রকন্যাগণ,
কাঁদিছেন মহাশোকে দেখ আসি হায়!
হয়ে তাঁরা মাতৃহীন ছিলেন যে এতদিন,
তব পূত শান্তিময় স্নেহের ছায়ায়।

(৫)

তুমি সিটি কলেজের—
হিতাকাঙ্ক্ষী ছাত্রদের—
সুদক্ষ অধ্যক্ষ ছিলে পিতার সমান;



স্বর্গীয় উমেশচন্দ্র দত্ত।

জন্ম—১২৪৭ সাল ৩রা পৌষ বুধবার কৃষ্ণা নবমী রাত্রি ৮ দণ্ড।

স্বর্গারোহণ—১৩১৪ সাল ৪ঠা আষাঢ় বুধবার শুক্লা নবমী রাত্রি ১০টা ৫০ মিনিট।

কাঁদিছে আজি যে তারা,
শোকে হয়ে আত্মহারা,
কর গো তাদের এসে সান্ত্বনা প্রদান।

(৬)

তুমি যে পরের তরে, স্বার্থ সুখ ত্যাগ করে,
খাটিতে দৈহিক কষ্ট তুচ্ছ জ্ঞান করি;
অনিদ্রায় উপবাসে, রোগীর শয্যার পাশে
থাকিয়া করিতে সেবা অনুক্ষণ ধরি।

(৭)

আত্ম-বন্ধু নাহি যার,মৃত্যু হলে তুমি তার,
স্বেচ্ছায় করিতে সেই দেহের সৎকার;
দীনা ভদ্র বিধবায়, নেহারিলে অসহায়,
তুমি যে সাহায্য কত করিতে তাঁহার।

(৮)

ক্ষুধিত দরিদ্রগণে, অন্ন দিয়ে সযতনে,
করিতে তাদের তুমি ক্ষুধা নিবারণ;
বিপন্নের উপকার, করিতে যে অনিবার,
পাওনি বিশ্রাম কভু এদের কারণ।

(৯)

ভারত-বালার যত, হিতে সদা ছিলে রত,
করিতে সম্মান কত তুমি রমণীর;
বামাকুলে বোধজ্ঞান, করিবারে সম্প্রদান,
হয়েছিলে সম্পাদক 'বামাবোধিনীর'।

(১০)

ভারতমহিলা যত, হয়ে আজি শোকাহত,
করিছেন দুঃখভরে নীরবে রোদন;
কেমনে গো স্নেহময়! হয়ে তুমি নিরদয়,
মোদের কাঁদায়ে কোথা করিলে গমন?

(১১)

কে আর তোমার ন্যায়, দিবে সে উৎসাহ হায়!
ভারতীয় নারীগণে সাহিত্য-চর্চ্চায়?
কে আর পরের তরে, তোমার মতন করে,
খাটিবে আপন স্বার্থে বলি দিয়ে হায়!

(১২)

উমেশ তোমার নাম, শিবময় অবিরাম,
অশিব সে পরিহরি মঙ্গল সাধিয়া—
মিলিতে উমার পাশে, গেলে কি কৈলাস-বাসে?
উমা তব অপেক্ষায় আছেন বসিয়া।

(১৩)

মৃত তোমা কেবা কয়? উমেশ যে মৃত্যুঞ্জয়,
সুকীর্ত্তিতে তুমি চির অজর অমর;
আমরা অবোধ যত, না বুঝিয়া অবিরত,
মৃত তোমা ভাবি শোকে হতেছি কাতর।

শোক-সন্তপ্তা অভাগিনী লেখিকা,—
শ্রীসুশীলাসুন্দরী মিত্র।

শোকোচ্ছ্বাস।

মানবজীবন হায় পলকে মিলায়!
ভারতভূমির প্রিয়, স্নেহময়, পূজনীয়,
আদর্শ দেবতা আজি কোথা চলি যায়?

কে জানে বিধির ইচ্ছা কত লীলাময়;
বিধাতা রহস্তপ্রিয়, মিটায় বাসনা স্বীয়,
আঘাতে ভাঙ্গিয়া দিয়া মানবহৃদয়।

সেদিন এসেছি দেখি স্নেহময় ছবি,
প্রফুল্ল দেবতা-মূর্ত্তি, সদা হাসি সদা স্ফূর্ত্তি,
সদা স্নেহপূর্ণ কথা তেজপূর্ণ রবি।

তিনি আজ স্বর্গপুরে নাহি আর ভবে,
শূন্য যেন চরাচর, শূন্য সেই বাড়ী ঘর,
তাঁহারে পোড়ায়ে ছাই করেছে মানবে।

স্বপ্ন ধরা, স্বপ্ন হায় মানবজীবন!
এত স্নেহ বিসর্জ্জিয়া,রব মোরা কি লইয়া,
জীবন কাটিবে করি অশ্রু বিসর্জ্জন।

সহসা ঝটিকাবেগে ফাটিছে হৃদয়।
সে মমতা,সেই স্নেহ,আর কি বিলাবে কেহ?
কোথায় চলিলে আজি ওহে স্নেহময়!

ঢালিয়া স্নেহের রক্ত প্রাণপণ করে
পেলেছিলে দেবোপম! স্নেহের দুহিতা সম
'বামাবোধিনী'রে তুমি পরম আদরে।

আজি যে সে অশ্রুমুখী তোমার লাগিয়া,
তোমারি সহিত হায়! বুঝি সে নিভিয়ে যায়,
মহিলার শিক্ষাদীপ নিভাইয়া দিয়া।

আর নাই উচ্চ আশা ফুরায়েছে সব,
যাও তুমি স্বর্গপুরে, শোক তাপ যাবে দূরে,
সহিবে অসহ্য শোক পাষাণ মানব।

শ্রীমতী সুরুচিবালা সেন,
বেনারস।

নূতন সংবাদ।

১। আগামী শীত ঋতুতে এডিনবরা নগরে ভারতীয় শিল্পজাতের একটী প্রদর্শনী হইবে। ঐ স্থানে বিলাতপ্রবাসী ভারতীয় ছাত্রগণের একটী সভা বসিবে। বারাণসী হইতে বহুবিধ উপাদেয় স্বদেশী শিল্পজাত প্রেরিত হইয়াছে।

২। আমেরিকাবাসী জে, টি, রোকিফেলার সম্প্রতি তত্রত্য সাধারণ শিক্ষা সমিতির হস্তে ৯,৬০,০০০০০ টাকা দান করিয়াছেন। কিরূপ সদুপায়ে ধনোপার্জ্জন করিতে হয়, এবং কিরূপে সেই উপার্জ্জিত ধনের সদ্ব্যবহার করিতে হয়, এই উদার অর্থনীতি বিষয়ে শিক্ষাদান তাঁহার এইরূপ অর্থদানের উদ্দেশ্য।

৩। আমরা গভীর শোকসন্তপ্ত হৃদয়ে অদ্য আরও দুইটী স্বদেশহিতৈষী মহাত্মার মৃত্যু সংবাদ প্রকাশ করিতেছি। হিতবাদী-সম্পাদক কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ মহাশয় এবং কলিকাতা পুলিশ কোর্টের খ্যাতনামা উকিল কালীচরণ পালিত আর ইহলোকে নাই। আমরা স্বদেশের আরও দুইটী উজ্জ্বল রত্ন হারাইলাম!

৪। যাঁহারা ভারতবর্ষ হইতে বিলাতে গিয়া বার্ম্মিংহাম বা মানচেষ্টার বিশ্ববিদ্যালয়ে বাণিজ্যবিদ্যা শিক্ষা করিবেন, এরূপ ছয়টী ছাত্রের জন্য ভারত গবর্ণমেণ্ট বার্ষিক ২২৫০৲ টাকা ছাত্র-বৃত্তিদানের ব্যবস্থা করিয়াছেন। তাঁহারা উন্নত পাশ্চাত্য প্রণালীতে শিল্প ও বাণিজ্যাদিবিষয়ক সম্যক্ জ্ঞান লাভ করিয়া স্বদেশে ফিরিয়া আসিয়া শিল্প ও বাণিজ্যের উন্নতি সাধন করিবেন।